# নতুন পৃথিবীর সন্ধানে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী · কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীগোপাল দাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৬৩

প্রচ্ছদ :—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীশীতলচন্দ্র ঘোষ
শ্রীধরনাথ প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

শ্রীমান শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ( বাপন )

ও

শ্রীমান সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ( সৌম্য )

কল্যাণবরেষু

**লেখকের অন্যান্য বই**

ভারততীর্থ পুষ্কর

ভূস্বর্গ কাশ্মীর

বিপাশা নদীর দেশে

রূপসী প্রতিবেশী

হিমালয়ের তিন সঙ্গী

গোমুখীর পথ ইত্যাদি

# আন্দামানের জঙ্গলে

আন্দামানের এক দ্বীপ। নির্জন, রহস্যময়। চারিদিক ঝোপ-
াড় আর জল-জঙ্গলে ভরা। সভ্য-পৃথিবীর মানুষ সেখানে যেতে
য় পায়। কারণ, অনেকেরই ধারণা, সেখানে জারোয়া নামে
াদিবাসীরা থাকে। ভীষণ হিংস্র আর সন্দেহপ্রবণ ওরা। সভ্য
ানুষকে মোটে সহ্য করে না। দেখলেই আক্রমণ করে, আর নয়তো
বেঁধে নিয়ে গিয়ে হত্যা।

জারোয়াদের আক্রমণ-পদ্ধতি বড় ভয়ঙ্কর। অরণ্যের আড়ালে
া চুপিসারে লুকিয়ে থাকে। তীরের ফলায় বিষ মাখিয়ে শত্রুকে
কিতে আক্রমণ করে। তাকে আত্মরক্ষার এতটুকু সুযোগ পর্যন্ত
দয় না।

যে দ্বীপটির কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেখানে আজ অবধি কেউ
কান জারোয়াকে স্বচক্ষে দেখে নি। এমনকি ওরা আদৌ ওখানে
াকে কিনা, সে ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। তবে অনেকের অনুমান,
াকাটাই স্বাভাবিক। কারণ, গত দু-তিন বছরের মধ্যে ঐ দ্বীপে
য়েকটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে।

প্রথম ঘটনা ঠিক আড়াই বছর আগেকার। দুষ্প্রাপ্য কিছু গাছ-
াছড়ার খোঁজে তিনজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ঐ দ্বীপে যান। ওঁরা
আন্দামান-নিকোবরের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার থেকে মোটরবোটে
করে গিয়েছিলেন। বোটটিকে দ্বীপের এক প্রান্তে নোঙর করা হয়।
বিজ্ঞানীরা দ্বীপে নেমে প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করছেন, বোটে বসে
চালক ও তার সহকারী এ-দৃশ্য দেখতে পায়। কিন্তু খানিক পর
থেকেই ওঁরা নিরুদ্দেশ; সহযাত্রীরা অনেক চেষ্টায়ও ওঁদের সঙ্গে
যোগাযোগ করতে পারে না।

দ্বীপে নেমেছিল ওরা। খানিকদূর অবধি খোঁজাখুঁজি করেছিল। কিন্তু বেশিদূর এগোতে ভরসা পায় নি জারোয়াদের

শেষ অবধি পুলিশের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিশেষ কোনো তৎপরতার পরিচয় ওরা দিতে পারেন নি। জারোয়া-ভ এমনভাবে ওদের আচ্ছন্ন করে যে, ঐ দ্বীপের মধ্যে বেশি এগোতেই ওরা সাহস পান নি।

শেষ অবধি ধরে নেওয়া হয়, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের কেউ বেঁচে নেই, জারোয়াদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

এই ঘটনার প্রায় দু' বছর পর নতুন এক দুর্ঘটনা। পাঁচ জনের এক পর্যটক-দল ঐ দ্বীপে যান। নেহাৎই কৌতূহলবশে যান ওঁরা। কিন্তু আশ্চর্য! ওঁদের একজনও ওখান থেকে ফেরেন না।

সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে মাস কয়েক আগে। এবার দুজন অ্যান্থ্রোপলজিস্ট-এর পালা। ওঁরা দুজনেই খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ব বা মানবের উদ্ভব, বিকাশ ও শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে দীর্ঘদিন মূল্যবান গবেষণা করেছেন। দেশবিদেশে খ্যাতি কুড়িয়েছেন প্রচুর। আন্দামান-নিকোবর অঞ্চলে ওঁরা এসেছিলেন আদিবাসী জারোয়াদের সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে। এই দ্বীপে অবতরণের পেছনেও ওঁদের ঠিক একই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বিস্ময়করই বলতে হবে, দ্বীপে নামলেন ওঁরা, এগিয়ে গেলেন, তারপর আর ফিরলেন না।

পরপর এইরকম কয়েকটি দুর্ঘটনায় দ্বীপটিকে ঘিরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ সংশয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠে তার ধারে কাছে যেতে।

পুলিশ রহস্য-ভেদের চেষ্টা মাঝে মাঝে অবশ্য করেছে, কিন্তু তা'তে মূল রহস্য বেড়েছে বৈ কমে নি।

ওদের কা'রও কা'রও ধারণা, কোনো জারোয়া ঐ দ্বীপে আদৌ নেই। বিজ্ঞানীদের দু-দুটি দল এবং পর্যটক-দল নিখোঁজ হয়েছেন অন্য কারণে। হিংস্র কোনো জন্তু-জানোয়ার অথবা কোনো প্রাকৃ

বিপর্যয় ওঁদের নিরুদ্দেশের কারণ। পুলিশের কেউ কেউ আবার বলেন, তা কী করে সম্ভব? হরিণ গোছের নিরীহ জানোয়ার ছাড়া বিশেষ কিছু তো ঐ দ্বীপে নেই। দুর্ঘটনার ধরন দেখে বরং মনে হয়, অরণ্যে পথ হারাবার ফলেই সব বিপত্তি। ভয়ে উৎকণ্ঠায় দিশাহারা হয় সবাই এবং শেষ পর্যন্ত পথ খুঁজে না পেয়ে মারা পড়ে।

শেষোক্ত মতটিকে বেশির ভাগ লোকই মেনে নেয় নি। সবাই প্রশ্ন তুলেছে, এ কোনো যুক্তি হল? এতগুলো লোকের মধ্যে একজন-ও পথ খুঁজে পেল না, একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? বিশেষ করে যাঁরা ওখানে গিয়েছেন তাঁদের কেউই হাবাগোবা নন। হয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বিজ্ঞানী, আর না হয় অভিজ্ঞ পর্যটক। এঁরা পথ খুঁজে না পেয়ে রাতারাতি হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেলেন? এমনকি একজনেরও দেহাবশেষের চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না? এ কখনও হতে পারে?

ভিন্ন মতের সমর্থক কোনো কোনো পুলিশ বললেন,—তা তো বটেই! যা খুশি একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিলেই হল? আমরা ব্যাখ্যা দিচ্ছি না, তবে আশঙ্কা করছি, এইসব দুর্ঘটনার পেছনে গুরুতর কিছু কারণ। দ্বীপ-পরিক্রমার সময় কদাচিৎ আমরা লক্ষ্য করেছি, তীরের খুব ধারে-কাছেই ডুবো-জাহাজ গোছের কী যেন, দু'-একবার উঁকিঝুঁকি মেরেই মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যায়। ঐ ডুবো-জাহাজ-জাতীয় বস্তুটার সঙ্গে নিখোঁজ যাত্রীদের সম্বন্ধ থাকলেও থাকতে পারে।

পুলিশদলের এই তিন নম্বর অভিমতকে কেন্দ্র করেও বাগ্‌-বিতণ্ডার ঝড় বয়ে যায়। অনেকে এ-নিয়ে এমনকি ঠাট্টা-তামাসাও করেন,—ও! তাই নাকি? যাক, জানা গেল তবু, তিমি বা হাঙর হলেও এবার থেকে ডুবো-জাহাজের কাজ চলবে। আর কা'রও না চলুক, অন্ততঃ পুলিশ-বিভাগের চলবে।

নিখোঁজ হতভাগ্যদের নিয়ে এই ধরনের তর্ক-বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখন আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার-এ এলেন ডঃ শরদীশ মুখার্জী ও শ্রী অশেষ বর্মন।

ডঃ মুখার্জী একজন নামকরা প্রাণিবিজ্ঞানী। তাঁর আন্দামান পরিদর্শনের উদ্দেশ্য, সামুদ্রিক কিছু প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করা। এ ছাড়া, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দু'-একটি জলচর প্রাণীর হালচাল তিনি নিজের চোখে দেখতে চান।

অশেষ বর্মনের অত নামডাক নেই। বয়সে ডঃ মুখার্জীর প্রায় অর্ধেক। প্রায় তিরিশ বছর বয়সী এই তরুণ যুবক একজন উঠতি শল্যচিকিৎসক বা সার্জেন। কলকাতায় ডঃ মুখার্জীর অধীনে গবেষণা করে। আন্দামান এসেছে প্রধানতঃ দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে :—এক, গবেষণার কাজে ডঃ মুখার্জীকে সাহায্য ; দুই, ঘুরে বেড়িয়ে খানিকটা ভ্রমণ-সুখ উপভোগ।

গবেষণার কাজে প্রাণিবিজ্ঞানী আর শল্যচিকিৎসকে কী করে যোগাযোগ ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

আপাততঃ এ-প্রশ্নের উত্তর বিস্তৃত করে না দিয়ে শুধুমাত্র এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, এঁদের দুজনেরই গবেষণার বিষয় 'ব্লাড সারকুলেশন' বা রক্ত-সঞ্চালন। বিষয়টি এমন অদ্ভুত যে, প্রাণি-বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র উভয়েরই আওতায় পড়ে।

আন্দামান পৌঁছে ডঃ মুখার্জী নিখোঁজ ব্যক্তিদের কথা শুনলেন। গবেষণার কাজে দূরের কোনো দ্বীপে যাওয়া যে বিপজ্জনক এ-কথা বলেও অনেকে তাঁকে সাবধান করে দিল।

ডঃ মুখার্জী এসব কথায় কান দেন নি। কারণ, তাঁর ধারণা, ভয় পেলে বা দ্বিধাগ্রস্ত হলে গবেষণা চলে না।

এসব ব্যাপারে অশেষ অবশ্য আরও একরোখা। বিশেষ যে দ্বীপটিকে ঘিরে বাগ্-বিতণ্ডা, সেখানে যাবার ব্যাপারেই তার যেন বেশি ঝোঁক।

এ নিয়ে ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে তার কিছু কথাবার্তা হল।

—স্যার, লক্ষ্য করুন,—অশেষ বললে, সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন উল্টোপাল্টা, রহস্যময়। স্থানীয়দের বেশির ভাগেরই ধারণা, ঐ দ্বীপে জারোয়ারা থাকে। যত কিছু অনাসৃষ্টির মূলে ওরাই। অথচ

পুলিশ-রিপোর্টে জারোয়াপ্রসঙ্গ আদৌ কোনো গুরুত্ব পায় নি। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে গিয়ে পরস্পর-বিরোধী অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু জারোয়া সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত। সবাই বলছে, আন্দামান-নিকোবরের কোনো কোনো দ্বীপে জারোয়ারা থাকে বটে, কিন্তু যে দ্বীপটিতে পর পর দুর্ঘটনা ঘটছে, সেখানে ওদের একজনও থাকে বলে কোনো প্রমাণ মেই।

ডঃ মুখার্জী বললেন,—হুঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। পুলিশ স্পষ্টই বলছেন, ঐ দ্বীপে কোনদিন কোনো জারোয়া চোখে পড়ে নি।

অশেষ বললে,—ব্যাপারটা সে কারণেই খুব রহস্যময়। সকলের আগে এর একটা ফয়সালা দরকার।

—সে কী!—সহকারীর মন্তব্যে ডঃ মুখার্জী একটু যেন বিরক্ত,—আমরা কি এখানে এসেছি রহস্য ভেদ করতে? সে কাজ পুলিশ এবং গোয়েন্দার। আমাদের আসার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা; এবং তা-ই আমরা করবো গুজবে কান না দিয়ে, অহেতুক আতঙ্কিত না হয়ে। আর তাছাড়া, বিশেষ ঐ দ্বীপটি সম্পর্কেই বা তোমার অত আগ্রহের কারণ কী?

অশেষ বিনীতভাবে বললে,—কে জানে, গবেষণার বিরাট কোনো উপকরণ হয়তো ঐ দ্বীপেই মিলতে পারে।

ডঃ মুখার্জী রীতিমত অবাক এবার। বললেন,—অশেষ, কী বলতে চাও তুমি?

—স্যার, আমি বলতে চাই, জনমানবহীন, পরিত্যক্ত ঐ দ্বীপে অদ্ভুত কোনো জন্তু-জানোয়ার থাকলেও থাকতে পারে। হয়তো বা প্রাগৈতিহাসিক কোনো জীবের শেষ বংশধর আছে ওখানে।

—কী যা তা বলছো তুমি! সমুদ্দুরের হাওয়া খেয়ে তোমার কি মাথা খারাপ হল?

—কেন স্যার, আজকালও তো কালেভদ্রে ওদের দেখা মেলে। ব্যাপারটা একেবারেই কি উড়িয়ে দেওয়া যায়?

—ছাখ অশেষ, তোমার শেষ প্রশ্নটির উত্তর আমি দেব না। তবে প্রথম প্রশ্নটি সম্পর্কে অন্ততঃ এটুকু বলতে পারি, আজও কালেভদ্রে যাদের দেখা মেলে তাদের প্রাগৈতিহাসিক আদল সামান্যই অবশিষ্ট।

—বেশ, তাই না হয় হল,— অশেষের সবিনয় নিবেদন,—কিন্তু তাদেরও দু'-একটির দেখা পেলে মন্দ কী?

—কী আশ্চর্য!—ডঃ মুখার্জী বেশ বিরক্ত এবার,—শুনেছ তো, ঐ দ্বীপে হরিণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো জন্তু-জানোয়ার নেই।

অশেষ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল,—হ্যাঁ স্যার, শুনেছি।

—তবে?

— কিন্তু অন্য কোনো জানোয়ার থাকলেও তো থাকতে পারে?

—তা তো সব জায়গাতেই পারে। এমনকি তোমার ঐ কলকাতা শহরেও পারে!

অশেষ চুপ করল এবার। আলোচনা ক্রমেই তর্কের রূপ নিচ্ছে আশঙ্কা করে কিছু আর বললো না।

ওদিকে ডঃ মুখার্জী আবার শুরু করলেন,—ছাখ, আলেয়ার পেছনে ঘুরে কোন লাভ নাই। তার চেয়ে কাজের কাজ করা যাক. যে উদ্দেশ্যে এসেছি তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা। কী, তোমার কী মত, খুলে বলো।

প্রশ্রয় পেয়ে অশেষ বলতে লাগলো,— স্যার, ভুলে গেলে চলবে কেন আপনার এক অতি প্রিয় বন্ধু ঐ দ্বীপে নিখোঁজ হন। বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডঃ শ্যামল হাজরার কথা আপনিই আমাকে বলেছিলেন। আজ থেকে আড়াই বছর আগে দু'জন সহকারীকে নিয়ে তিনি ঐ দ্বীপে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দুষ্প্রাপ্য কিছু গাছ-গাছড়া সংগ্রহ।

শ্যামল হাজরার কথা শুনে হঠাৎ খুব গম্ভীর হলেন ডঃ মুখার্জী। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, —ও, শ্যামল! সে ছিল একটা জিনিয়াস! আহা! বেচারী শেষটায় কিনা বেঘোরে প্রাণ দিল!

হাওয়া অনুকূল বুঝে অশেষ নতুন করে শুরু করল আবার,—স্যার, উনি প্রাণ দিয়েছেন এমন কথা বোধ করি বলা চলে না। কারণ, আজ অবধি ওঁর ঠিক তদন্তই কিছু হয় নি।

ডঃ মুখার্জী সায় দিলেন,—তা বটে, তা বটে! তদন্ত যা হয়েছে, তা'ও খুব সামান্য।

অশেষ বললো,—তাহলে দেখুন, আমাদের কি উচিত নয় এ-ব্যাপারে একটু তৎপর হওয়া?

ডঃ মুখার্জী বললেন,—হ্যাঁ, উচিত। একশোবার উচিত। কিন্তু কী আমরা করতে পারি?

—অনেক কিছু স্যার পারি,—অশেষ উৎসাহিত এবার,—ঐ দ্বীপে গিয়ে কিছুটা অন্ততঃ খোঁজ-খবর নিতে দোষ কী?

—বেশ, চলো তাহলে। যাওয়া যাক,—ডঃ মুখার্জী অনেকটা যেন স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বললেন।

শুরু হল যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন। ডঃ মুখার্জী পোর্ট ব্লেয়ারের পুলিশ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বিশেষ ঐ দ্বীপটিতে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে ওঁদের সাহায্য চাইলেন।

পুলিশ এই প্রবীণ বিজ্ঞানীর অনুরোধ এড়াতে পারেন নি। তিন জন সশস্ত্র প্রহরীকে ওঁর সঙ্গে যাবার অনুমতি দেন।

প্রহরীর ব্যাপারে অশেষের আপত্তি। বার বারই সে বলেছে, লোক বেশি হলে ঝামেলাও বেশি; নিরিবিলিতে পর্যবেক্ষণের অসুবিধে।

ডঃ মুখার্জী এসব কথায় কান দেন নি। সাধ্যমত সতর্ক হতে চেয়েছিলেন।

অশেষ বলেছিল,—আমার সঙ্গে রিভলবার আছে স্যার। বিপদে এই এক অস্ত্রই যথেষ্ট।

ডঃ মুখার্জী এ যুক্তি মেনে নেন নি। বলেছিলেন,—কী জানো, সাবধানের মার নেই। আর তাছাড়া, এখানকার জল-জঙ্গল সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা কতটুকু?

অশেষ এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি, অথবা দিতে চায় নি। অগত্যা পুলিশ-প্রহরী-সহ যাবার প্রস্তাবকেই মেনে নিয়েছিল।

এদিকে যাত্রার একেবারে শেষ মুহূর্তে বিপদ। প্রহরীরা বেঁকে দাঁড়াল, যাবে না। বেঘোরে প্রাণ দিতে ওরা নারাজ। এমনকি মোটর-বোট-এর চালক, যে নাকি মুখার্জীর কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে বসে, সে পর্যন্ত বলে দিল, যাওয়া সম্ভব নয়। নিরুপায় হয়ে ডঃ মুখার্জী স্থির করলেন, স্টীমারে যাবেন।

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এক ধরনের স্থানীয় লঞ্চ বা স্টীমার-সার্ভিস আছে। নির্দিষ্ট দিনে এক একটি স্টীমার যাত্রা করে; বিভিন্ন দ্বীপ পরিক্রমার পর আবার পোর্ট ব্লেয়ারে ফিরে আসে। ও অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এইসব স্টীমারের উপর খুবই নির্ভরশীল। কারণ, বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোর মধ্যে যোগাযোগ-রক্ষার এই হল প্রধান যানবাহন।

এ ধরনের স্টীমারে যাবার কিছু অসুবিধেও আছে। আন্দামান-নিকোবরের বেশির ভাগ দ্বীপেই এরা যায় না। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি দ্বীপই এদের নাগালের মধ্যে। ডঃ মুখার্জী ও অশেষের গন্তব্যস্থল যে দ্বীপ, স্টীমার সেখানে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

খবর নিয়ে ওঁরা জানালেন, দ্বীপটির দু' মাইল দূর দিয়ে স্টীমারের যাত্রাপথ। কোনমতেই সে পথ থেকে সরে এসে ভিন্ন কোনো পথ ধরা স্টীমারের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, ওসব অঞ্চলে সমুদ্র খুবই অগভীর। স্টীমার নতুন পথে গেলে মারাত্মক বিপদ হতে পারে। এমনকি চড়ায় আটকে যাওয়া বা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়াও বিচিত্র নয়।

এ খবর শুনে অবধি ডঃ মুখার্জী বেশ দমে গেলেন। কারণ, তাঁর ক্ষীণ আশা ছিল, স্টীমার-সার্ভিস-এর মুরুব্বিদের অনুরোধ করলে ওঁরা হয়তো কথা রাখবেন; কুখ্যাত দ্বীপটিকে ছুঁয়ে না হোক, অন্ততঃ পাশ দিয়ে স্টীমারটিকে যাবার অনুমতি দেবেন।

শেষ অবধি ঠিক হল, দ্বীপ থেকে দু মাইল দূরেই ওঁরা নামবেন। লক্ষ্যস্থলের দিকে যাবেন 'লাইফ বোট'-এ চেপে। বোট স্টীমার-সার্ভিস-এর কর্তৃপক্ষ দেবেন। তবে এ-জন্যে কিছু টাকা জমা রাখতে হবে ওঁদের কাছে।

ফেরার ব্যবস্থাও আগে থাকতেই ঠিক হল। স্টীমারটি ঠিক দশ দিন বাদে দুপুর দু'টো নাগাদ এ পথ দিয়ে যাবে। ডঃ মুখার্জী ও অশেষকে লক্ষ্য রাখতে হবে খানিক আগে থাকতেই। বহুদূর থেকেও স্টীমারটি ওদের দেখতে পাবার কথা।

দেখা মাত্রই প্রস্তুত হবেন ওঁরা; 'লাইফ বোট' নিয়ে এগোবেন।

এ ছাড়া, দশ-পনেরো দিনের উপযোগী রসদও সঙ্গে থাকবে। তবে পানীয় জলের জন্যে ভাবনা নেই। পুলিশ-কর্তৃপক্ষ অভয় দিয়েছেন, অতি আবশ্যকীয় এই জিনিসটি সে-দ্বীপে নাকি অপর্যাপ্ত।

দেখতে দেখতে যাবার দিন ঘনিয়ে আসে। ডঃ মুখার্জী ও অশেষ সাধ্যমত প্রস্তুত হতে থাকেন। স্থানীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও অযাচিতভাবে সাহায্য করে। কিন্তু যাবার ঠিক আগের দিন বিপদ। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, দুটি তরুণ পোর্ট ব্লেয়ার থেকে নিরুদ্দেশ।

ওপর ওপর দেখলে এ ঘটনার তেমন কিছু গুরুত্ব নেই। কেননা যে কোনো শহরে হামেশা এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে।

কিন্তু ডঃ মুখার্জীর কথা আলাদা। তিনি এই সামান্য ব্যাপারটাকেই বড় করে দেখলেন। আশঙ্কিত হলেন এই ভেবে যে, নিশ্চয় এর সঙ্গে সেই রহস্যময় দ্বীপের কোনো সম্পর্ক আছে।

—খবর শুনেছ?—অশেষকে প্রশ্ন করলেন তিনি। অস্বাভাবিক-রকম গম্ভীর ও উদ্বিগ্ন তাঁর চোখমুখ।

অশেষ নিরুদ্বিগ্ন। জানতে চাইল,—কোন্ খবর?

—পোর্ট ব্লেয়ার থেকে দুটি তরুণ নিখোঁজ!

—ও, হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে।

—কী শুনেছিলে?

—তিন জন তরুণ সমুদ্রের তীরে পায়চারি করছিল। এমন সময় মুখোসধারী কে বা কা'রা নাকি ওদের আক্রমণ করে। একজন কোনমতে পালিয়ে বাঁচে। কিন্তু অন্য দু'জন সেই থেকে নিরুদ্দেশ।

—ঠিকই শুনেছ। কিন্তু কেন ওরা নিরুদ্দেশ, তার কিছু আঁচ পেলে?

—না, ও নিয়ে মাথা ঘামাই নি।

—আমি ঘামিয়েছি। আমার মনে হয়, এর সঙ্গে ঐ কুখ্যাত দ্বীপের যোগ আছে।

এবার অশেষের অবাক হবার পালা। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল সে,
—আপনার এই সন্দেহের কারণ?

ডঃ মুখার্জী ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন,—কারণ অবশ্যই আছে। সবচেয়ে বড় কারণ, এ ঘটনার কয়েক মিনিট বাদেই সমুদ্রতীরের কেউ কেউ অদ্ভুতদর্শন একটি জাহাজ দেখতে পায়। জাহাজটি চোখের পলকে অদৃশ্য হয়, এ-কথাও অনেকে বলেছে।

—তা বলুক। তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।—অশেষ সমস্ত ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায়।

কিন্তু ডঃ মুখার্জী অত সহজে দমবার পাত্র নন। সঙ্গে সঙ্গেই নতুন যুক্তি দিলেন,—ছাখ অশেষ, আমার ধারণা কিন্তু ভিন্নরকম। পুলিশদপ্তর থেকে খবর নিয়ে জানলাম, গত আড়াই বছরে পোর্ট ব্লেয়ার শহরে এ-ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ প্রায় প্রতিবারেই মুখোসধারীর আক্রমণ, তরুণের নিরুদ্দেশ এবং অদ্ভুতদর্শন জাহাজের চকিত আবির্ভাব।

অশেষ বললো,—কিন্তু স্যার, এর সঙ্গে ঐ দ্বীপের কী সম্পর্ক?

ডঃ মুখার্জী বুঝিয়ে দিলেন,—সম্পর্ক আছে। তলিয়ে দেখলে তুমিও স্বীকার করবে।

অশেষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। 'হ্যাঁ-না' কিছু বললো না। ওদিকে একটু থেমে ডঃ মুখার্জী আবার শুরু করলেন,—কী জানো, পুলিশ-রিপোর্টের এক জায়গায় আছে, ঐ দ্বীপ পরিক্রমার সময় ধারে-কাছেই ডুবো-জাহাজ গোছের কী যেন চোখে পড়ে। দু'একবার উঁকিঝুঁকি মেরেই মুহূর্তের মধ্যে তা মিলিয়ে যায়। ঐ ডুবো-জাহাজ এবং পোর্ট ব্লেয়ারের সমুদ্রে অদ্ভুতদর্শন জাহাজ—এই দুয়ের মধ্যে কোথায় যেন যোগ রয়েছে। এছাড়া, আরও একটা কথা,—দু জায়গাতেই নিখোঁজরা কর্পূরের মতো উবে গেছে। একবার বেপাত্তা হবার পর কা'রও সম্পর্কেই বিন্দু-বিসর্গও জানা যায় নি।

অশেষ বললো.—কী আশ্চর্য! এখন দেখছি, দ্বীপ সম্পর্কে আপনার সংশয় আমার চেয়েও অনেক বেশি।

ডঃ মুখার্জী স্বীকার করলেন,—তা বলতে পারো।

—অথচ গোড়াতে আপনি মোটে আমলই দেন নি। দ্বীপের ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

—তখন কি আর অত কিছু জানতাম! তবে হ্যাঁ, একটা কথা, দ্বীপে গিয়ে কতদূর কী করা যাবে, সে-ব্যাপারে এখনও কিন্তু সন্দেহ আছে আমার।

যাই হোক, শেষ অবধি সন্দেহ-শঙ্কা মাথায় নিয়ে ওঁরা যাত্রা করলেন। সমুদ্র উত্তাল সেদিন। আকাশে কালো মেঘের আনা-গোনা। খানিক বাদে সারা আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল।

এদিকে হাওয়ার দাপটও বাড়ছে ক্রমেই। স্টীমারটা দুলছে অস্বাভাবিকরকম। যেন নাগরদোলা—ঢেউ নামক রাক্ষুসে খেলনায় চেপে আকাশে ওঠো একবার, পরক্ষণেই আবার নীচে নামো।

স্টীমারটা মাঝ-সমুদ্রে যায় নি এখনও, যাচ্ছে তীরের কাছাকাছি কোনো এলাকা দিয়ে। কিন্তু সাধ্যি কী যে কেউ তা বোঝে! বৃষ্টি এবং ঝড়ো হাওয়ার যোগসাজসে এমনকি দশ হাত দূরের জিনিসও

অস্পষ্ট। ভালো করে তাকাবার পর্যন্ত জো নেই। স্টীমারের মাইকে ঘোষণা থেকেই শুধু জানা গেল, যাত্রীরা কোথায় আছেন, কতদূর এসেছেন।

প্রকৃতির এই রুদ্ররূপ দেখে অশেষ এবং ডঃ মুখার্জী দুজনেই গম্ভীর। কারও মুখে কোন কথা নেই।

শেষকালে নীরবতা ভাঙ্গলো অশেষ,—স্যার, মনে হচ্ছে, ভাগ্য বিরূপ। ঝড় এবং বৃষ্টির জোট বেঁধে শত্রুতা। এভাবে চললে দ্বীপটির কাছাকাছি যেতে যেতে সন্ধ্যে। সেক্ষেত্রে আমরা নামবো কী করে? পৌঁছুবোই বা কখন?

দুরূহ প্রশ্ন, তবে সন্দেহটা অমূলক কিছু নয়, সঙ্গতই বরং,—ডঃ মুখার্জী ভাবলেন, কেননা, যে দ্বীপটিতে ওঁরা যাচ্ছেন পোর্ট ব্লেয়ার থেকে তার দূরত্ব ষাট মাইল। স্টীমার ঠিকভাবে চললে সকাল আটটায় রওনা দিয়ে দুপুর নাগাদ ওখানে পৌঁছুবার কথা। কিন্তু যেভাবে সে চলছে, তা'তে সন্দেহ জাগে, আদৌ পৌঁছুন যাবে কিনা। একান্তই যদি যায়ও, 'লাইফ বোট' নিয়ে সমুদ্রে নামা কি সম্ভব? ডঃ মুখার্জী তাই অশেষের প্রশ্নের উত্তর দিলেন একটু ঘুরিয়ে,—দেখা যাক, কী দাঁড়ায়। বেগতিক বুঝলে আমরা ধারে-কাছের কোনো দ্বীপে নেমে পড়বো।

—কিন্তু স্যার, ধারে-কাছের দ্বীপ বলতেও যে অনেক দূরের—ঐ দ্বীপটি থেকে পনের মাইল। ওখানে নেমে আমাদের কী লাভ হবে স্যার?

—খানিকটা এগিয়ে থাকা, এই আর কী!

—পিছিয়েও বলতে পারেন। কারণ, ঐ দ্বীপ থেকে লক্ষ্যস্থলে যাবার যানবাহন তো কিছু পাবো না!

—কী মুশকিল!—ডঃ মুখার্জী একটু যেন আহত,—কী পাবো, আর কী পাবো না, তা কি আগাম বলা চলে?

অশেষ চুপ করল এইবার। বাইরের দিকে তাকাল।

আশ্চর্য! ঝড়-বৃষ্টির দাপট অনেকটা কমেছে এর মধ্যে! কে যেন মন্ত্রবলে আকাশ-বাতাসকে দিব্যি শান্ত করে দিয়েছে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি ছেড়ে গেল। আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হল। স্টীমারের গতিবেগও বাড়তে লাগল ক্রমেই।

ডঃ মুখার্জী ও অশেষ উভয়েই আশ্বস্ত এইবার। আশা হচ্ছে, অবস্থা এরকম থাকলে আজই উদ্দিষ্ট দ্বীপটিতে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে।

কিন্তু কোথায় সে দ্বীপ? শেষ পর্যন্ত স্টীমার যে জায়গায় ওদের নামিয়ে দিল সেখান থেকে দ্বীপের কিছুই চোখে পড়ে না।

ডঃ মুখার্জী কোনোমতে একটি মানচিত্র মেলে ধরলেন। টলতে টলতে ঝুঁকে পড়লেন তার উপর। তিনি ঠিকভাবে বসতেও পারছেন না। 'লাইফ বোট' ভীষণরকম দুলছে।

মানচিত্রটি খানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডঃ মুখার্জী বললেন,—হ্যাঁ, ঠিক জায়গাতেই নেমেছি। তবে দ্বীপ যে চোখে পড়ছে না তার কারণ, ওদিকে বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকটা এখন ঝাপসা, অস্পষ্ট।

বৃষ্টির খবর শুনে অশেষ দমে গেল। নতুন বিপদের সম্ভাবনায় আঁতকে উঠল রীতিমত। কী আশ্চর্য! খানিক আগেও আকাশ পরিষ্কার ছিল। অনেকটা দূর থেকেও দ্বীপটি স্পষ্ট চোখে পড়ছিল ওদের। আবার বৃষ্টি শুরু হবে, একথা কা'রও মনেই আসে নি। মনে এলে নিশ্চয় আজ ঝুঁকি নিত না কেউ, ধারে-কাছের কোনো দ্বীপে আশ্রয় নিত।

কিন্তু দ্বীপ তো দূরের কথা, স্টীমারটি পর্যন্ত চোখে পড়ছে না এখন। মুহূর্তের মধ্যে সে-ও যেন অদৃশ্য।

ডঃ মুখার্জী বললেন,—ব্যাপার ভালো ঠেকছে না। আজকের আবহাওয়ায় না এলেই ভালো ছিল।

অশেষ সমর্থন করল,—যা বলেছেন। কিন্তু এখন যাবোই বা

কোন্‌দিকে ? এমনকি স্টীমারটাও চোখে পড়ছে না। চোখে পড়লে না হয় ডাকা যেত। বরং ফিরে যেতাম আমরা।

ডঃ মুখার্জী বললেন,—না, সে পথও বন্ধ। কারণ, স্টীমার যে-দিক দিয়ে যাচ্ছে, সেদিকেও বৃষ্টি। ঐ তো, ছাখ না, কেমন ঝাপসা ঠেকছে ওদিকটা।—

বলেই আঙুল তুলে কী যেন দেখালেন।

অশেষ দেখল, ঠিক তা'ই। বৃষ্টির দাপটে ওদিকও ঝাপসা, অস্পষ্ট।

এদিকে হাওয়ার বেগ বাড়ছে। তামাম আকাশ জুড়ে মেঘের দাপাদাপি। দেখতে দেখতে 'লাইফ বোট' এলাকাতেও বৃষ্টি শুরু হল।

প্রথমে গুঁড়ি গুঁড়ি, তারপর মুষলধারে। বৃষ্টির তাণ্ডব এক-একবার কমে আসে আর সঙ্গে সঙ্গেই চেপে ধরে ঝড়ো হাওয়া। বৃষ্টিবিন্দুগুলোকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে চোখেমুখে যেন ছুঁচ ফোটায় এসে।

কখনও আবার ছুঁচ নয়, চাবুক। দমকা হাওয়া খুশিমত তেড়ে এসে সপাসপ চাবুক চালায়। দুঃখে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেন দুই অভিযাত্রী। কিন্তু তবু কিছুই করার নেই। 'লাইফ বোট'কে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেন ওঁরা। সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের পথে পাড়ি জমান।

সমুদ্রের ঢেউ থেকে থেকে আছড়ে পড়ে ওঁদের ওপর। ঢেউয়ের এক-একটা চুড়ায় চেপে পরক্ষণেই ওঁরা তরতরিয়ে নেমে আসেন। ভালো চোখে পড়ে না কিছুই। আশঙ্কা হয়, বুঝি ঢেউয়ের তালে-তালে স্বর্গে উঠছেন এক-একবার, পরক্ষণেই আবার পাতালে নামছেন।

'লাইফ বোট'কে নির্দিষ্ট কোনো দিকে চালনার ব্যাপারে এখন আর কোনো কর্তৃত্বই নেই ওঁদের। অকুল পাথারে অসহায়ভাবে

ভেসে চলেছেন দুজন। কোথায় যাবেন, কোন্ জাহান্নমে গিয়ে ঠেকবেন, কেউ জানেন না।

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। তামাম সমুদ্র জুড়ে কৃষ্ণকায় অদ্ভুত এক যবনিকা যেন দুলতে দুলতে, ভাঁজ খুলতে খুলতে এগিয়ে এল।

এখন পরিবেশ আরও ভয়ঙ্কর। ঢেউয়ের ওপরকার সাদা ফেনাগুলো চিকচিক করছে। যেন লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে ভয় দেখাচ্ছে সব।

খানিকক্ষণ বাদে।

ঝড়-বৃষ্টি থেমেছে। সমুদ্র শান্ত। কিন্তু তখন দুজনেরই সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। এমনকি কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

ডঃ মুখার্জী ফিসফিস করে ডাকলেন,—অশেষ, কোথায় এলাম আমরা? কত দূর?

অশেষ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল,—জানি না।

তাও তো বটে! জানবেই বা কী করে? সব যে অন্ধকার!—ডঃ মুখার্জীর কথায় ক্লান্তি ও হতাশা।

তবে কিছু মিথ্যে বলেন নি তিনি। চারিদিক তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন।

কিছুক্ষণ পর এই মেঘও কাটল। আকাশ পরিষ্কার হল। চাঁদ দেখা দিল।

এইবার জ্যোৎস্নার ম্লান আলোকে ওঁরা দেখলেন, সামান্য দূরেই এক দ্বীপ। জমাট অন্ধকারে ঠাসা।

ডঃ মুখার্জী বা অশেষ—কা'রও বুঝতে কষ্ট হল না, জমাট অন্ধকারের স্তূপগুলো হচ্ছে দ্বীপের গাছ-গাছড়া।

মুহূর্তও দেরি নয় আর। 'লাইফ বোট' নিয়ে দ্বীপটির দিকে ওঁরা এগোলেন। কোনোমতে তীরে নামলেন এসে।

কিন্তু কী ক্লান্তি! কী ক্লান্তি! দাঁড়াতেও পারলেন না ডঃ

মুখার্জী, তীরে নেমেই বালির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বয়স কম বলেই হয়তো অশেষ তখনও অতটা কাবু হয় নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্বীপটিকে সে দেখছিল।

কী ভীষণ নির্জন এই দ্বীপ! জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ঝোপ-জঙ্গলে চারিদিক আচ্ছন্ন। থেকে থেকে ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে। কিন্তু তাও স্পস্ট নয় তেমন। কারণ, সামনেই সমুদ্র। গর্জনের বিরাম নেই সেখানে।

অশেষ এবার বেলাভূমি পেরিয়ে কয়েক পা এগোল, জঙ্গলের কিনারায় স্তব্ধ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে-থাকা নারকেল-কুঞ্জ বরাবর।

কিন্তু যেতে না যেতেই বিপদ। পাখিদের কিচির-মিচিরে কানে তালা লাগবার উপক্রম। যেন জায়গাটা নিষিদ্ধ। আগন্তুকের আবির্ভাবে কেউ সুখী নয়। তাই উড়ে পালাচ্ছে কেউ; কেউ বা নীড়ে বসে প্রতিবাদ জানাতে ব্যস্ত।

এদিকে অশেষের সর্বাঙ্গ নতুন করে ভিজে গেছে। পাখিদের দাপাদাপিতে গাছ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। বৃষ্টির জল। তখনও অবধি যা নাকি পাতার ফাঁক-ফোকরে আটকে ছিল।

অশেষ ঠিক করল, বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না। ফিরে গিয়ে ডঃ মুখার্জীর খবর নেয়া যাক বরং।

ধীরে ধীরে এগোল অশেষ। ফিরবার সময় এই দ্বীপটি সম্পর্কে নানান আশঙ্কা তাকে ঘিরে ধরল। ওরা ঠিক দ্বীপেই এসেছে তো? না কি ঝড়-বাদলের দৌরাত্ম্যে ভিন্ন কোথাও?

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে বেলাভূমির ওপর দিয়ে হাঁটছিল অশেষ। এমন সময় হঠাৎ ওর চোখে পড়ে, ডঃ মুখার্জী উঠে দাঁড়িয়েছেন: 'লাইফ বোট'টিকে টেনে-হিঁচড়ে বেলাভূমির দিকে আনছেন।

অশেষ তাড়াতাড়ি এগোয় এবার। ডঃ মুখার্জীকে সাহায্য করে।

ভদ্রলোক দারুণ ক্লান্ত তখন। রীতিমত টলছেন।

অশেষ তা লক্ষ্য করে বললো,—স্যার, আপনি বরং বিশ্রাম নিন, বসুন। যা করার আমি করছি।

—না, তার কোনো দরকার হবে না।—হঠাৎ জলদ-গম্ভীর স্বরে কে যেন বলে উঠলো,—ঐ করা-না-করার ভারটা আমার ওপর থাক।

—কে? কে আপনি?—অশেষ এবং ডঃ মুখার্জী একই সঙ্গে আঁতকে ওঠেন। প্রায় একই কথা উচ্চারণ করেন। অশেষ নিমেষের মধ্যে ওর পকেটে হাত দিল রিভলবার বের করবে বলে।

কিন্তু তারও বুঝি সময় নেই। হঠাৎ কে যেন ছায়ামূর্তির মতো ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার দু হাতে দুটো রিভলবার।

—নড়বেন না। পালাবার চেষ্টা করবেন না,—ছায়ামূর্তির কড়া নির্দেশ,—হাত তুলে দাঁড়ান। অস্ত্রশস্ত্র কী আছে, দেখা যাক।

অশেষ ও ডঃ মুখার্জী যন্ত্রচালিতের মতো হাত তুললেন। রাক্ষুসে আকৃতির একটি লোক এগিয়ে এসে অশেষের পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিল। তল্লাশের হাত থেকে ডঃ মুখার্জীও রেহাই পেলেন না।

ছায়ামূর্তি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত এবার। অভয় দিল,—ওকে ভয় পাবেন না। আমার সহকারী। কাজে সহোয্য করছে।

কাজ! সহকারী! বলে কী লোকটা? কী চায় ও?

ডঃ মুখার্জী ও অশেষের মাথায় আকাশ-পাতাল ভাবনা।

ওদিকে ছায়ামূর্তির নতুন নির্দেশ কানে আসছে,—নিন, চলুন এবার, আমাদের সঙ্গে। বেশি দূরের পথ নয়, কয়েক মিনিটের মাত্র।

—কোথায় যেতে হবে?—অশেষ জানতে চায়।

—ল্যাবরেটরীতে।

—ল্যাবরেটরী! এই জঙ্গলে!

—হুঁ।

ছায়ামূর্তির জবাব সংক্ষিপ্ত। এদিকে সহকারীও চুপ করে নেই।

ছায়ামূর্তির নির্দেশকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে,—চলুন। অযথা দেরি কেন ?

ডঃ মুখার্জী ও অশেষ কোনোরকম দ্বিরুক্তি না করে এগোলেন। ছায়ামূর্তি চলতে লাগল সকলের আগে আগে। মাঝখানে অশেষ ও ডঃ মুখার্জী। সকলের পেছনে ঐ সহকারী।

দুর্গম পথ। ঝোপ-জঙ্গলে চারিদিক প্রায় আচ্ছন্ন। যেখানে জঙ্গল একটু কম, মাটিতে পা রাখতে হচ্ছে, সেখানে বিপদ আরও বেশি। খানিক আগেকার বৃষ্টির দাপটে সে-সব জায়গা মারাত্মক রকম পিছল, যে কোনো মুহূর্তে পা হড়কাতে পারে।

ডঃ মুখার্জী ও অশেষ খুব সতর্ক। পা টিপে টিপে এগোচ্ছেন। জঙ্গলের আনাচে-কানাচে সামান্যতম শব্দ হলেও থমকে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

কিন্তু ছায়ামূর্তির যেন আর তর সয় না। সবাইকে পেছনে ফেলে হনহন করে ছুটছে একরকম। খানিকটা এগিয়ে যায়, খানিকক্ষণ আবার দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করে।

এইভাবে কয়েক মিনিট কাটল। তারপর দলটি এসে দাঁড়াল এক খুদে পাহাড়ের সামনে। পাহাড়ও ঠিক নয়, টিলা—তার চারিদিক জঙ্গলে আচ্ছন্ন।

ছায়ামূর্তি হনহন করে এগিয়ে সেই জঙ্গলের ভেতর ঢুকল। যেন একটা ঢিল, জলে পড়তে না পড়তেই অদৃশ্য!

বাকি দলটি অন্ধের মতো ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করল। পথ এবার চড়াই। উঠতে গিয়ে ডঃ মুখার্জী হাঁপাতে লাগলেন।

অশেষও ক্লান্ত। অনভ্যস্ত প্রায়-অন্ধকার পথে ঘন ঘন হোঁচট খাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে ভাবছে,—কোথায় চলেছি? কোন্ জাহান্নমে? শয়তান দুটো আসলে কী চায়? আমাদের নিয়ে কী করবে ওরা?

ডঃ মুখার্জীও আতঙ্কিত, বিস্ময়ে উৎকণ্ঠায় দিশাহারা। এরই

মধ্যে বুঝে নিয়েছেন, এই সেই দ্বীপ, যাকে নিয়ে এতদিন ধরে এত বাগ্‌বিতণ্ডা। না না, দ্বীপে আসতে ভুল কিছু হয় নি, ঝড়-বাদল ঠিক জায়গাতেই ওদের পৌঁছে দিয়েছে।

কিন্তু কেমনতর জায়গা এ? এসে অবধি মানুষ নামক যে দুটো জীবের সঙ্গে দেখা, হিংস্র পশুর চেয়েও তাদের ভাবভঙ্গী রহস্যময়।

তবে কি এরাই এ দ্বীপের সব কিছু দুর্ঘটনার মূলে?

দেখাই যাক না,—ডঃ মুখার্জী ভাবলেন,—বিপদ যে-কোনোদিক থেকে আসতে পারে, এমন আশঙ্কা তো আগে থাকতেই ছিল। আর তাছাড়া, সম্ভাব্য সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই যখন আসা, তখন আর অযথা ভয় কেন?

—সাবধান! হুঁশিয়ার!—সেই রাক্ষুসে সহকারীর চীৎকার শোনা যায় হঠাৎ,—সামনেই সুড়ঙ্গ। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে।

ডঃ মুখার্জী ও অশেষ নিরুপায়। সহকারীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন।

সুড়ঙ্গ পেরোতেই গুহার মতো একটা জায়গা। ওখানে মিটমিট করে আলো জ্বলছে।

ডঃ মুখার্জী স্পষ্ট দেখলেন, আলোর ঠিক গা-ঘেঁষে কে যেন বসে, কথা বলছে। ওর ঠিক সামনেই স্ট্যাচুর মতো কয়েকটা মূর্তি। কিছু করছে না, বলছে না, শুধু শুনছে।

আরও একটু এগোতে বোঝা গেল, নিথর মূর্তিগুলো আসলে মানুষ। বাধ্য হয়েই যেন ওখানে বসে। কিন্তু কে এমন করে বাধ্য করল ওদের? জাদু করল? আলোর গা-ঘেঁষে বসে-থাকা ঐ মানুষটি কী কথা বলছে?

কিন্তু ঐ মানুষটিই বা কে? খানিক আগে দেখা ছায়ামূর্তি নয় তো?

আরও একটু এগোতেই স্পষ্ট বুঝলেন ডঃ মুখার্জী,—হ্যাঁ, তা'ই বটে। ছায়ামূর্তিই ওখানে। খানিক আগে এসে দিব্যি জমিয়ে বসেছে।

ডঃ মুখার্জী ও অশেষ কাছাকাছি হতেই সহকারীকে নির্দেশ দিল সে,—পাশের কামরায় নিয়ে যাও। এ দু'জন আপাততঃ ওখানেই থাকবে।

ডঃ মুখার্জী ও অশেষকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগোতে হল। কিন্তু কামরা কোথায়? যে জায়গায় এলেন ওঁরা, আসলে সেটিও একটি গুহা, বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন।

এ গুহাটি আগের গুহাটির তুলনায় আকারে ছোট। এখানে আলোও অপেক্ষাকৃত কম। গুহায় ঢুকবার ছোট্ট একটি পথ ছাড়া দরজা-জানালা বলতে আর কিছুই নেই।

ছায়ামূর্তির সহকারী ডঃ মুখার্জী ও অশেষকে গুহায় পৌঁছে দিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নিল। যাবার সময় গুহার একমাত্র প্রবেশ-পথটি বাইরে থেকে বন্ধ করতে সে ভোলে নি।

কিন্তু প্রবেশ-পথের ঠিক পাশেই কে ও? আধো-অন্ধকারে কী যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে! ডঃ মুখার্জী ও অশেষ দু'জনেরই সন্দেহ হল, লোকটি নিশ্চয় অন্ধ। দৃষ্টিশক্তি থাকলে কেউ কখনও অমন আচরণ করে না।

কয়েক মুহূর্ত বাদেই বোঝা গেল, হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। দেখতে পায় না বলেই লোকটি সেই থেকে ছটফট করছে; নতুন কেউ যে এখানে এল, শব্দ শুনে নিশ্চয় সে তা টের পেয়েছে।

কিন্তু সে এখানে কেন? কেউ কি জোর করে তাকে আনল?

ডঃ মুখার্জী শেষ অবধি আর স্থির থাকতে পারলেন না। আচমকা প্রশ্ন করলেন লোকটিকে, কে আপনি?

—আমি শিবেন বাগচী, অ্যানথ্রোপলজিস্ট্!—যেন কবরের তলা থেকে কথা কইল কেউ। ভাঙা ও বিকৃত তার কণ্ঠস্বর।

ডঃ মুখার্জী আঁতকে উঠলেন। অশেষও বিস্মিত। ঠিক সেই মুহূর্তে শিবেন বাগচীর মুখোমুখি হয়ে ডঃ মুখার্জী প্রশ্ন করলেন আবার,—আপনি এখানে কেন?

—ভাগ্যের ফেরে।

—তার মানে?

—মানে-টানে কিছু নেই। ব্যাপারটার মূলে দুর্ঘটনা।

—অর্থাৎ?

—একদিন এই দ্বীপে আসি গবেষণার তাগিদে, জারোয়াদের সম্পর্কে নতুন কিছু জানবো, এই আশায়। সঙ্গে ছিলেন আর একজন অ্যানথ্রোপলজিস্ট, আমার বিশিষ্ট বন্ধু ডঃ অমল চক্রবর্তী। কিন্তু এই দ্বীপে আসতে না আসতেই কী হল?....ওফ! ভাবতেও পারি না, কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! কী নিদারুণ জবরদস্তি!

কেন? কী এমন হয়েছিল?—অশেষ প্রশ্ন করল এইবার, শিবেনবাবুর উপর ঝুঁকেই একরকম।

এদিকে ডঃ মুখার্জীরও প্রায় একই প্রশ্ন,—কী হয়েছিল আসলে?

শিবেন বাগচী বলতে লাগলেন,—যা হয়েছিল হুবহু তা বললে কি বিশ্বাস করবেন?....এই দ্বীপে পৌঁছুন মাত্রই আমরা বন্দী হই। আমরা বলতে আমি ও আমার বন্ধু অমল চক্রবর্তী। আমাদের বন্দী করে গণেশ ও প্রফেসার সরখেল।....গণেশকে চিনলেন তো?.... যে নাকি এই বন্দী-ঘরে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে গেল।....লোকটা প্রফেসার সরখেল-এর সহকারী, যত সব কুকীর্তির সাক্ষী।

অর্থাৎ?—ডঃ মুখার্জী প্রশ্ন করেন শিবেনবাবুকে, মাঝপথে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে।

শিবেনবাবু খানিক দম নিয়ে শুরু করেন আবার,—কী জানেন, কুকীর্তির বলি এখানে অনেক। এই ধরুন না কেন আমার কথা। দুটো চোখই হারিয়ে বসে আছি। পুরোপুরি অন্ধ এখন।

—কিন্তু কী করে এই সর্বনাশ হল আপনার?—কৌতূহলের আতিশয্যে অশেষ নিজেকে যেন আর সামলাতে পারছে না। এক নিমেষে সব কিছু জানতে চাইছে।

এদিকে শিবেনবাবুও জানাবেন বলে প্রস্তুত। ধীর শান্ত কণ্ঠে

তিনি বলতে লাগলেন,—আমার সর্বনাশের কথা বুঝবার আগে প্রফেসার সরখেলকে জানতে হবে। লোকটি একজন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী, দীর্ঘদিন ধরে গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করছেন। ওঁর টাকার অভাব নেই, লক্ষ লক্ষ টাকার পৈতৃক সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছেন। তবে সম্পদে কোনোদিনই ওঁর মন ওঠে নি। আকাশের রহস্য হামেশা ওঁকে অস্থির করে তুলতো। একবার কী করে যেন উনি একখণ্ড উল্কা সংগ্রহ করেন। জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখছেন, এমন সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত জিনিস ওঁর নজরে পড়ে। উনি দেখতে পান, উল্কার ঠিক মাঝখানে কাচের মতো কী যেন একটা পদার্থ। অদ্ভুত স্বচ্ছ আর ঝলমলে। ঐ পদার্থটার ভেতর দিয়ে ভালো করে তাকাতেই উনি অবাক। বহুদূরের গাছপালা, যেগুলো নাকি খালি চোখে অস্পষ্ট ধূসর, উল্কাখণ্ডটির দৌলতে তা'রাও দিব্যি স্পষ্ট। তবে দেখবার সময় বড় কষ্ট হল প্রফেসার সরখেল-এর। তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তিনি প্রথমটায় এ-বিপত্তির কারণ ঠিক বুঝতে পারেন নি, তাই উল্কাখণ্ডটি হাতে নিয়ে আবার পরীক্ষা করেছিলেন। আবার তাকিয়েছিলেন দূরের জিনিসের দিকে। কিন্তু এবারেও ঠিক একই বিভ্রাট, ওঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। উনি তখন ঠিক করলেন, আলো-প্রতিসরণের ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে, যা'তে চোখের ওপর বাড়তি কোনো চাপ না পড়ে। এই ভেবে উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে বাড়তি কয়েকটি 'লেন্স্' যোগ করলেন। এমনভাবে জিনিসটার রূপ দিলেন যে, দূর থেকে দেখে মনে হবে একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

এবার চাঁদের দিকে তাক করলেন প্রফেসার সরখেল। প্রতিবেশী উপগ্রহটিকে কৌতূহলভরে নিরীক্ষণ করলেন। না না, এ কাজে দু-দুটো চোখকে তিনি ব্যবহার করেন নি, শুধুমাত্র একটিকেই কাজে লাগিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর ভয় ছিল, যদি অঘটন কিছু ঘটে, অর্থাৎ যদি চোখ শেষ অবধি খারাপ হয়ে যায় তো একটি অন্ততঃ

অক্ষত থাকবে। আশ্চর্য! শেষ অবধি তাঁর আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হল। বিশেষ এই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চালাতে গিয়ে তিনি একটি চোখ হারালেন। প্রথমটায় অবশ্য কিছু টের পান নি। মুগ্ধ বিস্ময়ে চাঁদকে দেখেছিলেন—চাঁদের পাহাড়-পর্বত ও গহ্বরগুলোকে তো বটেই, ছোটখাটো নুড়িগুলোকে পর্যন্ত। যেন তিনি চাঁদের উপর দাঁড়িয়ে, হাত বাড়ালেই যে কোনো একটি নুড়িকে কুড়িয়ে নিতে পারেন। ওখানে কত রকমের যে নুড়ি! কত রঙ্-বেরঙের! এত বিচিত্র রঙের সমারোহ পৃথিবীতে কখনও চোখে পড়ে না। আর তাছাড়া, চাঁদের আকাশটাও কী অদ্ভুত! কী আশ্চর্যরকম কালো! ওখানে মিটমিট করে জ্বলছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র। যেন ভুবনজোড়া দেওয়ালী। প্রফেসার সরখেল এইসব অনুপম দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন। কিন্তু না, তবু আত্মহারা হন নি তিনি। কারণ, তাঁর আশঙ্কা ছিল, আগ্রহের আতিশয্যে একনাগাড়ে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। খানিকক্ষণ দেখবার পর দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিলেন তিনি। খানিকটা আশ্বস্তও হলেন। কারণ, এবার আর চোখ ধাঁধিয়ে যায় নি। চোখে কোনোরকম জ্বালা-যন্ত্রণাও হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রফেসার সরখেল-এর; পরদিন সকাল থেকেই উপসর্গ দেখা দিল। ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল চোখটা। অনবরত তা দিয়ে জল ঝরতে লাগল। কয়েকদিন পরে নতুন ফ্যাসাদ—চোখে জ্বালাযন্ত্রণা। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। ক্রমেই তিনি কম দেখছেন। অগত্যা চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেন প্রফেসার সরখেল। আসল ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বিশেষজ্ঞকে শুধু চোখের অসুবিধের কথা বললেন। চিকিৎসা চলেছিল পুরোদমে। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হয় নি। মাস দুয়েকের মধ্যে তাঁর একটা চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায়।

এ আঘাতে প্রফেসার সরখেল খুবই দমে যান। কাজকর্ম কিছু-

দিন বন্ধ রাখেন। কিন্তু তাতেই বা শান্তি মেলে কই। মন বরং থেকে থেকে অশান্ত হয়ে ওঠে। উল্কাখণ্ডটিকে ঘিরে নানান অদ্ভুত কল্পনা মাথায় এসে ভিড় করে। কখনও বা নানা জাতের কাচ বসিয়ে জিনিসটাকে তিনি নতুন কোনো রূপ দেবার চেষ্টা করেন।

শেষ পর্যন্ত রূপ তিনি দিলেনও। কিন্তু তা দিয়ে পরীক্ষা করতে আর সাহস পেলেন না। প্রতি মুহূর্তেই ভয়, যদি তাঁর দ্বিতীয় চোখটাও খারাপ হয়ে যায়।

এদিকে মন বড় চঞ্চল। ঐ অদ্ভুত জিনিসটাকে দেখলেই কেমন যেন লাগে। কৌতূহল চারিদিক থেকে এসে ঘিরে ধরে। বার বার ইচ্ছে হয়, একবার অন্ততঃ পরখ করে দেখতে দোষ কী!

এই যখন প্রফেসার সরখেল-এর মনের অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁকে থেমে থাকলে চলবে না, এগোতেই হবে। পরীক্ষা নিজে না করেন অন্যকে দিয়ে করাবেন। হয়তো ঝুঁকি থাকবে এতে, অন্যের বিপদের সম্ভাবনা থাকবে, কিন্তু তিনি নিরুপায়। এমন একটা তাজ্জব জিনিসকে তিনি হেলায় নষ্ট করতে পারেন না। কে জানে, এ জিনিস হয়তো নিত্য নতুন রহস্যের জট খুলবে, বিশ্বজগতের দুর-দুরান্তরের খবর ঘরে বসিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। হয়তো এরই সাহায্যে জানা যাবে, মঙ্গলগ্রহে প্রাণী আছে কিনা। জানা যাবে, দূরের আর কোন্ কোন্ সূর্যকে ঘিরে কোথায় কোন্ পৃথিবী অবস্থান করছে। জানা যাবে শত শত নক্ষত্রলোক, নীহারিকা, ছায়াপথ....

ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে ওঠেন প্রফেসার সরখেল। তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজে প্রথম কা'কে নিয়োগ করবেন তা নিয়ে শুরু করেন জল্পনা-কল্পনা।

কিন্তু না, কাউকেই ঠিক মনে ধরে না। একদল বাতিল হয়ে যায় ওদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে। ওরা দূরের জিনিসকে দেখলেও বুঝবে কতটুকু? জানাবে কী? অন্যদল, যারা নাকি বুঝবে, প্রকৃত

অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতে পারবে, তাদের নিয়ে অন্য বিপদ। পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের দীর্ঘদিন বাদেও যদি কিছু অঘটন ঘটে অর্থাৎ যদি ওদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় তো সর্বনাশ! কেন না, ওরা কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করবে, অর্থাৎ প্রফেসার সরখেল-এর বিশেষ জিনিসটির মধ্য দিয়ে দেখবার ফলেই যে চোখ নষ্ট হয়েছে তা ধরে ফেলবে। তখন উপায়? তিনি আইনকে সামলাবেন, না বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকে? এছাড়া ভিন্ন বিপদও আছে। তিনি নিজে না দেখে অপরকে দেখতে দিচ্ছেন. যে কোনো বুদ্ধিমান লোক প্রথমেই এ নিয়ে সন্দেহ করবে। এমনকি ছলে বলে কৌশলে সন্দেহকে তিনি যদি কাটিয়েও উঠতে পারেন তো শেষ অবধি মুক্তি নেই। অন্যরা ব্যাপারটা জেনে ফেলবে। অর্থাৎ কিনা, তাঁর মূল পরীক্ষা শুরু হবার আগেই চারিদিকে হৈ-চৈ পড়বে। না না, এ হতেই পারে না। প্রফেসার সরখেল নিরিবিলিতে কাজ হাসিল করতে চান। মূল পরীক্ষায় সফল হবার পর তামাম দুনিয়াকে হঠাৎ করে চমকে দিতে চান।

কিন্তু কীভাবে এই দুরূহ কাজ তিনি করবেন? আকাশ-পাতাল ভেবেও থৈ পান না। দিন পেরোয়, মাস গড়ায়, বছর ঘুরে আসে, কিছুতেই কূলকিনারা মেলে না।

শেষকালে অনেক ভেবে তিনি ঠিক করলেন, দুর্গম কোনো জায়গায় যাবেন। এমন জায়গায়, সাধারণ মানুষের যা ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেখানে গিয়ে একের পর এক পরীক্ষা চালাবেন তিনি, আটক করা মানুষকে হুকুম করে পর্যবেক্ষণের কাজ করতে বাধ্য করবেন। এজন্য ছলনার আশ্রয় নিতে হবে তাঁকে, নিরীহ মানুষকে হয়তো বন্দী করতে হবে। কিন্তু এছাড়া, অন্য কোনো উপায়ও নেই।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধে, বিপদ হলে বলবার কেউ নেই। কেননা, পরীক্ষা সফল না হওয়া অবধি বন্দী মানুষদের তিনি

হাতছাড়া করছেন না। বন্দীরা শত চেষ্টাতেও যেতে পারছে না কোথাও। তাঁর পরীক্ষার কথাও কেউ জানছে না।

কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? এমন সুবিধের জায়গা পৃথিবীর কোথায় আছে? ভাবতে ভাবতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কথা মনে এলো তাঁর। তিনি চিন্তা করলেন, অজস্র ছোট-বড় দ্বীপ সে-অঞ্চলে ছড়িয়ে। সভ্য পৃথিবীর মানুষ বেশির ভাগ দ্বীপেই পা দেয়নি এখনও। ঐ সব দ্বীপের মধ্যে যে কোনো একটিকে যদি বেছে নেওয়া যায় তো কাজের সুবিধে। নিশ্চিন্তে গবেষণা চালানো যাবে। কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারবে না;

কিন্তু আন্দামানের কোন্ দ্বীপে তিনি যাবেন? কী করে যাবেন? সেখানে তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কিভাবে হবে? পর্যবেক্ষণের কাজ চলবে কিভাবে? এবং এসব কিছুর চেয়েও বড় কথা. যাদের নিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণের প্রাথমিক কাজ চালাবেন তারা আসবে কোত্থেকে?

দেখতে দেখতে এই ধরনের অজস্র প্রশ্ন প্রফেসার সরখেলকে অস্থির করে তুললো। দিনরাত্রি শুধুমাত্র একটিই চিন্তা: তিনি যাবেন, কাজ চালাবেন, সফল হবেন; কিন্তু কী করে?

একদিন হঠাৎ গণেশের দিকে ওঁর চোখ পড়ল। প্রফেসার সরখেল-এর সেক্রেটারী গণেশ। বড় বিশ্বস্ত আর অমায়িক প্রকৃতির তরুণ। বেশ লেখাপড়া জানে। বয়স পঁচিশ পেরোয় নি। তিন কুলে কেউ নেই ছোকরার। সরখেলকে আশ্রয় করেই দিব্যি আছে। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে শর্ট-হ্যাণ্ড এবং টাইপ-রাইটিং পর্যন্ত বহু কিছু ওর নখদর্পণে।

প্রফেসার সরখেল অনেক ভেবেচিন্তে দেখলেন, আন্দামানের নির্জন দ্বীপে এর চেয়ে ভালো সঙ্গী আর কেউ হতে পারে না। এছাড়া, ওখানকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সূচনাও গণেশকে দিয়েই করা চলে।

গণেশের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে যদি তিনি ব্যর্থ হন তো ভিন্ন পথ নিতে হবে। যেমন করে হোক ভিন্ন লোক পেতে হবে তাঁকে।

দিন কয়েকের মধ্যেই কাজ শুরু হল। প্রথম ঘাঁটি হিসাবে বেছে নেওয়া হল পোর্ট ব্লেয়ারকে। প্রফেসার সরখেল ঠিক করলেন, শুরুতে গণেশকে নিয়ে ওখানে যাবেন। না না, বিমানে যাবেন না, জাহাজই সুবিধেজনক। জলপথে গেলে অনুমতি-পত্র লাগে না। আর তাছাড়া, নানা ধরনের লোকজনের সঙ্গে আলাপের সুযোগ।

কী আশ্চর্য। সমুদ্র-যাত্রার প্রথম দিনেই প্রফেসার সরখেল-এর প্রত্যাশা পূরণ হল। জাহাজে অদ্ভুত কয়েকজন লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটল তাঁর। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলরাম আঢ্য। লোকটার চাল-চলন আগাগোড়াই সন্দেহজনক। প্রফেসার সরখেল ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানলেন, আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপ সম্পর্কে ও অনেক কিছু জানে। এছাড়া দেশ-বিদেশ জুড়ে ওর নানান ধরনের ব্যবসা।

চমৎকার! অতি সুন্দর! প্রফেসার সরখেল-এর মনে হল, এ-ধরনের জাঁহাবাজ ও অভিজ্ঞ লোকই ওঁর দরকার। বলরাম-এর সহযোগিতা পেলে নির্জন কোনো দ্বীপে থেকেও মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাবে। বসবাস এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের জন্যে আবশ্যক জিনিসপত্রাদি পেতেও বিশেষ অসুবিধে হবে না।

পোর্ট ব্লেয়ারে নেমে বলরাম-এর সঙ্গে সরখেল-এর পরিচয় আরও গাঢ় হল। ক্রমেই সরখেল জানতে পারলেন, বলরাম একজন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। টাকার জন্যে সব কিছু করতে পারে।

অবশ্য এ নিয়ে সে খোলাখুলি কিছু বলে নি। বলা সম্ভবও নয়। আভাসে-ইঙ্গিতে যতটুকু বলেছিল, তা থেকেই প্রফেসার সরখেল অনুমান করলেন, লোকটার চোরাই ব্যবসা আছে। দেশ-বিদেশে বেআইনীভাবে সে মালপত্র পাচার করে।

বলরাম-এর মতো একটা শঠ লোকের সাহায্য নিতে যাচ্ছেন,

এই ভেবে প্রফেসার সরখেল এক-একবার মুষড়ে পড়লেন। সাহায্য নেবেন কি নেবেন না, তা নিয়ে বারবার ভাবলেন। কিন্তু না, শেষ অবধি নেওয়াই সঙ্গত মনে হল। কারণ, উপাই নেই সরখেল-এর। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণে সফল হতে গেলে এ অন্যায়টুকু তাঁকে করতেই হবে। আর তাছাড়া, অন্যায়ের সম্ভাবনা আগাগোড়াই থাকছে। গণেশের চোখের অবস্থা কী দাঁড়াবে, তিনি জানেন না। নিরীহ আরও দু-চারজনের চোখও নষ্ট হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত বলরাম-এরই পরামর্শে সরখেল এই দ্বীপটিকে বেছে নিলেন। এখানে পানীয় জল আছে, জারোয়ার ভয় নেই, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নগণ্য। চোরাই ব্যবসার কাজে বলরাম এ দ্বীপে বহুবার আশ্রয় নিয়েছে। এ-সম্পর্কে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা।

এতক্ষণ অবধি একটানা কথা বলছিলেন অ্যানথ্রোপলজিস্ট্ শিবেন বাগচী। হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে দিল অশেষ। বললো,—দেখুন, অনেকের কিন্তু এখনও ধারণা, এ দ্বীপে জারোয়াদের উৎপাত আছে।

শিবেন বাগচী বললেন,—এ ধারণা স্বাভাবিক। কারণ, সরখেল-এর পরামর্শে বলরাম এই দ্বীপটি সম্পর্কে খুব ভালো প্রচার চালিয়েছিল। এ-ধরনের প্রচারের সুবিধে, দ্বীপটিকে ঘিরে বেআইনী সব রাজকর্মের দায় জারোয়াদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে।

কিন্তু না, ওসব কথা থাক। আসল প্রসঙ্গে আসি। বলরাম ও গণেশকে নিয়ে প্রফেসার সরখেল একদিন এই দ্বীপে এলেন।

আসবার সব ব্যবস্থা বলরাম করে। ছোটখাটো একটি জলযান সংগ্রহ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। বলরাম-এর পাপচক্রের যারা সাকরেদ তাদের হেফাজতে এসব যানবাহন মজুত থাকে, বলা বাহুল্য।

দ্বীপে পৌঁছে থাকবার জায়গা বেছে নিলেন প্রফেসার সরখেল; বলরাম এর পরামর্শে গুহামতো এই জায়গাটিতে এলেন।

চোরাই কাজ-কারবারের সময় বলরাম এখানে বহুবার থেকেছে। তবে সরখেল একনাগাড়ে বেশিদিন থাকবেন, এই ভেবে জায়গাটির কিছু সংস্কার করা হল। কিছু বাঁশ ও বুনো গাছগাছড়ার ডাল জুড়ে দিব্যি বাসযোগ্য করা হল একে। বলরাম এখানে বসবাসকারীদের কিছুদিন চলবার মতো রসদ পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল। কিছুদিন বাদে বাদে সে আসবে, নতুন রসদ পৌঁছে দেবে—এই হল ব্যবস্থা।

বলরাম এসব কাজের জন্য প্রচুর টাকা পেল। অভাব নেই টাকার। বলেছি আগেই, প্রফেসার সরখেল-এর বাড়ীর অবস্থা ভালো। উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী।

সরখেল অবশ্য সম্পত্তির তোয়াক্কা করেন না। বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁর মনপ্রাণ উৎসর্গীকৃত। নতুন কিছু জানার সুযোগকে তিনি সম্পত্তির চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান মনে করেন।

বলরাম চলে যাবার পর সরখেল আসল কাজে মন দিলেন। উল্কাখণ্ড ও লেন্স্-এর সহযোগে গঠিত যন্ত্রটিকে নানারকম মাপজোঁক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উঁচুমত একটা জায়গায় বসানো হল।

এবার গণেশের পালা। যন্ত্রের ভেতর দিয়ে তাকাবার জন্যে হতভাগ্যকে ডাকা হল।

গণেশ এতে একটু বিস্মিত। সে ভাবতে পারেনি, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কাজে তারও কিছু করণীয় আছে।

কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে গেল সে। যন্ত্রটির ভেতর দিয়ে তাকাল। অবশ্য তাকাবার ব্যাপারে তার কোনো স্বাধীনতা নেই। সরখেল মঙ্গলগ্রহ-বরাবর যন্ত্রটিকে তাক করে তাকে দেখবার সুযোগ দিয়েছেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! মঙ্গলগ্রহ একেবারে স্পষ্ট তার সামনে। যেন সে গ্রহটিরই উপর দাঁড়িয়ে। মঙ্গলের লাল মাটি, মেঘে-ঢাকা আকাশ, খুদে খুদে জলভরা সব নদী যেন তারই মুখোমুখি একেবারে। গণেশ বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হয়ে গেল; বার বার খুঁজে-পেতে দেখতে চাইল, ওখানে জীব আছে কি না।

ওদিকে সরখেল-এর তাড়া,—আজ থাক। আর একদিন দেখো।

শেষ অবধি নিরুপায় হয়ে গণেশ চোখ সরিয়ে নিল। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে।

দু-তিন দিনের মধ্যে বেচারার ডান চোখটার দফা রফা। বাঁ চোখ অবশ্য অক্ষতই ছিল। কেননা, সরখেল-এর নির্দেশে শুধুমাত্র একটি চোখই ব্যবহার করার সুযোগ পায় ও।

চোখ হারিয়ে হাহাকার করে উঠল গণেশ। সরখেল-এর কাছে বার বার জানতে চাইল,—কেন এই সর্বনাশ, বলুন?

কী আর বলবেন সরখেল! তিনি নিজেই কি এর কারণ জানেন? অবশ্য গণেশকে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, না না, এ কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে কোনো যোগ নেই এর। আসলে এ একটি দুর্ঘটনা।

কিন্তু তা-ই বা কী করে সম্ভব?—গণেশ বলে,—দুর্ঘটনা তো কিছু ঘটে নি! বরং মঙ্গলগ্রহের ঐ অদ্ভুত জিনিসগুলো দেখবার পর থেকেই যত সব বিপত্তি বুঝি যন্ত্রটিই সব কিছু নষ্টের গোড়া!

—না না, তা কখনও হতে পারে না!—সরখেল-এর আপত্তি।

গণেশ-এর কিন্তু সন্দেহ কাটে না। সে লক্ষ্য করেছে, কিছুদিন থেকে সরখেল-এর নিজেরও একটা চোখ নেই। বিশেষ করে এই যন্ত্রটা হাতে আসবার পর থেকেই তাঁর এ অবস্থা।

সরখেল বোঝেন সব। যন্ত্রই যে সর্বনাশের মুলে তা বুঝতে তাঁর এতটুকু কষ্ট হয় না।

তবে কি মারাত্মক কোনো আলোক-রশ্মি উল্কাখণ্ডের ভেতর দিয়ে প্রতিসরিত হয়?—সরখেল আপন মনেই জল্পনা করেন,—মহাবিশ্বের এমন রশ্মি এসে চোখে লাগে যা মারাত্মক?

কে জানে, হলেও হতে পারে।—কত সময় সরখেল চিন্তা করেন,—বুঝি অজানা আলোক-রশ্মির প্রতিক্রিয়াই দুজনের দু-দুটি মুল্যবান চোখকে নষ্ট করে দিল!

কিন্তু প্রতিক্রিয়া কি এক-এক ক্ষেত্রে এক-এক রকম ?—নিজেকেই তাঁর জিজ্ঞাসা—কারণ, তা-ই যদি না হবে তো গণেশের চোখ তাঁর তুলনায় আরও তাড়াতাড়ি খারাপ হল কেন ? তিনি দেখেছেন চাঁদকে, আর গণেশ দেখেছে মঙ্গলগ্রহকে। চাঁদের তুলনায় মঙ্গল অনেক দূরে বলেই কি আলোক-রশ্মির আঘাত শেষোক্ত ক্ষেত্রে বেশি ? তবে কি যত বেশি দূরের জিনিসকে দেখা যাবে, অজানা রশ্মিজনিত বিপদের সম্ভাবনাও তত বাড়বে ?

ভাবতে ভাবতে দিশাহারা হন সরখেল সঠিক কোনো জবাব খুঁজে পান না। এদিকে তাঁর সারাক্ষণের অনুচর গণেশের একটি চোখ গেছে ; দ্বিতীয়টিকে দিয়ে পরীক্ষা চালানো বিপজ্জনক। কেননা সেটিও যদি যায় তো শুধু গণেশই নয়, সরখেলও অসুবিধেয় পড়বেন—বিপজ্জনক এই দ্বীপে পুরোপুরি এক অন্ধকে নিয়ে তাঁর দিন কাটাতে হবে।

অতএব গণেশ নয় এবার, ভিন্ন কাউকে চাই।

প্রফেসার সরখেল পর্যবেক্ষণের আশায় উপকরণ খোঁজেন আবার। বলরাম-এর পথ চেয়ে বসে থাকেন। কারণ, রসদ ফুরিয়ে আসছে, মাথায় দুশ্চিন্তা।

এদিকে বলরাম মানুষটি বিশ্বস্ত, কথার খেলাপ করে নি। সময়-মতো রসদ নিয়ে তো এলোই, সঙ্গে আনল তিন-তিনটি জ্যান্ত মানুষ। ওরা সবাই বলরাম-এর হাতে বন্দী। বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডঃ শ্যামল হাজরা ওদেরই একজন।

এইখানে শিবেন বাগচীর গল্পে আবার বাধা পড়ল, পুরনো বন্ধু ডঃ হাজরার নাম শুনে আর্তনাদ করে উঠলেন ডঃ মুখার্জী। বললেন, —শ্যামল ! কোথায় সে ? বেঁচে আছে কি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে ;—আশ্বাস দেন শিবেন বাগচী,—শ্যামলবাবু সম্পর্কে সব কথাই ধীরে ধীরে জানতে পারবেন।....

তারপর শুনুন, যা বলছিলাম,—উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কথা....।

বলরাম চাতুরীর বলে ওদের বন্দী করে। জাহাজ থেকে সাকরেদ মারফত ও খবর পায়, তিনজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়ার খোঁজে আন্দামান আসছেন। এই খবর পাওয়া মাত্রই পোর্ট ব্লেয়ার-এ আসে ও, বিজ্ঞানীদের নেতা ডঃ হাজরার সঙ্গে দেখা করে।

ডঃ হাজরাকে আশ্বাস দেওয়া হয়, গাছ-গাছড়া যা নাকি ওঁরা খুঁজছেন তা মুষ্টিমেয় দু'একটি দ্বীপে মাত্র পাওয়া যায়। সেই দ্বীপের খবর ওর নখদর্পণে। প্রয়োজন হলে এমনকি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেও সে রাজী।

ডঃ হাজরা সরল মানুষ। সহজেই বলরামকে বিশ্বাস করলেন। স্থির হল, বিশেষ এক মোটর বোট-এ করে ডঃ হাজরা ও তাঁর সহযোগী দুজন বিজ্ঞানী যাত্রা করবেন। সঙ্গে থাকবে বলরাম ও তার কয়েকজন অনুচর। দ্বীপে পৌঁছে সবাই মিলে সাহায্য করবে হাজরাকে ; যাতে কোনদিক দিয়েই কোন অসুবিধে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

হ্যাঁ, লক্ষ্য রেখেছিল বৈকি। খুব রেখেছিল। সঙ্গী দুজনসহ ওঁকে বন্দী করার সব ব্যবস্থা আগে থাকতেই পাকা করে যতটুকু লক্ষ্য রাখা সম্ভব ঠিক ততটুকুই।

এই দ্বীপে পৌঁছুন মাত্রই বিজ্ঞানীরা বন্দী হলেন। মোটর বোটটি বলরাম-এরই দলের লোকের। এতএব অসুবিধে কিছু হয়নি। বরং দ্বীপে নেমে বিজ্ঞানীরা নিরুদ্দেশ,—বলরাম পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছুবার পর এ-গুজব ছড়িয়ে পড়ায় সুবিধেই হয়েছিল। জনসাধারণ থেকে পুলিশ পর্যন্ত সবাই ধরে নিতে পেরেছিল, দুর্ঘটনার মূলে জারোয়ারা। ওরাই জলজ্যান্ত তিন জন বিজ্ঞানীকে অপহরণ অথবা হত্যা করেছে।

এদিকে বিজ্ঞানীকে পেলে প্রফেসার সরখেল-এর বিশেষ সুবিধে। কারণ, সাধারণের তুলনায় ওঁরা দেখে বেশি, বোঝে তাড়াতাড়ি, বোঝায় ভালো। দূর-আকাশের অদ্ভুত কিছু দেখতে পেলে ওঁরা যত

সুন্দরভাবে তা বুঝতে এবং বোঝাতে পারবে, সাধারণ মানুষ তা পারবে না।

বিজ্ঞানবিদ্যায় পারদর্শী লোকদের সম্পর্কে সরখেল-এর দুর্বলতার কথা বলরাম জানতো। সেজন্যেই অনেক ফন্দিফিকির করে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের সে ধরে আনে। তবে অমনি আনে নি। মোটা টাকা ইনাম পাবার লোভেই এনেছিল।

অবশ্য কিছু দ্বন্দ্ব সরখেল-এরও ছিল। বিজ্ঞানী অন্ধ হয়ে যেতে পারেন, সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে পারেন, এসব তিনি ভাবেন নি, এমন নয়। তবে ভাবনায় শেষ অবধি তাঁর নিজের স্বার্থবুদ্ধিই জয়ী হয়েছিল। যেমন করে হোক, দূর-আকাশের রহস্য ভেদ করতে হবে, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা।

অন্য কোনো বিজ্ঞানী তাঁর আবিষ্কারের গৌরব যদি ছিনিয়ে নেন? না না, কোনমতেই তা তিনি হতে দেবেন না। দরকার হলে সেই বিজ্ঞানীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু তবু কিছুতেই হার মানা চলবে না।

দেখতে দেখতে নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন প্রফেসার সরখেল। নির্জন দ্বীপে অদ্ভুত পরিবেশে জীবন-যাপন করে গণেশও ক্রমেই নির্মম হয়ে উঠল। এই যখন ওদের মনের অবস্থা তখন—

এইখানে ফের বাধা। শিবেন বাগচী গল্প বলতে বলতে থেমে গেলেন। দূর থেকে প্রচণ্ড আর্তনাদ ভেসে এলো। যেন কেউ বুকফাটা চীৎকার করছে।

—কে? কে ওখানে?—ডঃ মুখার্জী জানতে চাইলেন।

অশেষও বিস্ময়ে আতঙ্কে দিশেহারা। সভয়ে প্রশ্ন করল,—কী হয়েছে? কা'র চীৎকার?

শিবেন বাগচী কা'রও প্রশ্নের জবাব দিলেন না। চুপচাপ থাকলেন।

এদিকে চীৎকারটা দূরে সরছে ক্রমেই। মনে হতে লাগল, গহন অরণ্যের একেবারে শেষ প্রান্তের দিকে সরছে।

অশেষ ও ডঃ মুখার্জী দম বন্ধ করে বসে রইলেন। যেন প্রশ্ন করার শেষ শক্তিটুকুও নেই আর।

খানিক বাদে। শিবেন বাগচীই মুখ খুললেন,—আহা। শ্যামল হাজরা, বেচারী! চোখ হারিয়ে পুরো অন্ধ এখন এবং সে-দুঃখেই এখন উন্মাদ।

—শ্যামল তাহলে সুস্থ নেই আর? নামেই বেঁচে আছে!—ডঃ মুখার্জীর প্রশ্নে দুঃখ ও বেদনা উপচে পড়ে।

ঠিক সেই মুহূর্তে শিবেন বাগচী অনেকটা সংযত। নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দেন,—শ্যামলবাবুর মানসিক বিকৃতি একদিন সারলেও সারতে পারে। কিন্তু চোখ ফিরে পাবার সম্ভাবনা তো আর দেখছি না।

অশেষ নিজে সার্জেন। এ-ব্যাপারে মন্তব্য না করে পারে না, —দেখুন, আগাম কিছু বলা ঠিক নয়। সার্জারী আজকের দিনে অসম্ভবকে সম্ভব করছে।

—তাই নাকি?—শিবেন বাগচী অন্ধকারের মধ্যে একটু যেন আলো দেখতে পান,—তবে তো আমারও আশা আছে।

—হ্যাঁ, আছে, আলবৎ আছে,—ডঃ মুখার্জীর সান্ত্বনা,—যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

—কিন্তু কেন জানি না,—শিবেন বাগচী বলতে লাগলেন,—এক এক সময় সব আশা-ভরসা হারিয়ে ফেলি। মনে হয়, অন্ধকার—তামাম দুনিয়া জুড়ে শুধু অন্ধকার। এখানে আশা নেই, আনন্দ নেই, মুক্তি নেই, শান্তি নেই; শুধু আছে দুঃখ, বেদনা আর গ্লানি।

ডঃ মুখার্জী বললেন,—কিন্তু এ তো আপনার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা, একেবারে হাল আমলের ধারণা। অন্ধ অবস্থায় বন্দী-জীবন-যাপনের অনুভব। এর আগের কথা কিছু বলুন। এখানে এলেন কী করে? দেখলেন কী? পর্যবেক্ষণের সময় নতুন কী জিনিস আপনার নজরে পড়ল?

শিবেন বাগচী জানালেন,—দেখুন, কী করে এলাম, এ প্রশ্নের জবাব আগেই মোটামুটি দিয়েছি। শুধু একটা কথাই বলি নি যে, আমি আর আমার বন্ধু ডঃ অমল চক্রবর্তীর সর্বনাশের মূলেও ঐ বলরাম। শয়তানটার সঙ্গে ঘটনাচক্রে আলাপ পোর্ট ব্লেয়ারে এসে। এ-দ্বীপে সে-ই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। তবে হ্যাঁ, দ্বীপে নেমে যখন বন্দী হই, তখন সে সামনে ছিল না, আড়ালে চাবিকাঠি নাড়ছিল। আমাদের বন্দী করে প্রফেসার সরখেল ও তাঁর সহচর গণেশ, আগেই তা বলেছি। বলার যা নাকি বাকী তা হল, নির্মমতা আর শয়তানিতে প্রফেসার তখন বলরামকে প্রায় ধরে ফেলেছেন।

কিন্তু না, থাক তবু। শয়তানির কথা খোলসা করে বলে লাভ নেই। বরং অভিজ্ঞতার কথা বলি।

এই দ্বীপে আমাকে আলাদা করে রাখা হল, অন্য সকলের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। তখনও আমি আসল ব্যাপার কিছুই জানি না। তবে অনুমানে বেশ বুঝেছি, চরম কোনো সর্বনাশ আসন্ন।

একদিন। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। গণেশ ডাকল,—আপনাকে একটু বাইরে যেতে হবে।

আঁতকে উঠি;—হঠাৎ বাইরে! কেন? কী মতলবে?

একবার ভাবলাম, হয়তো বা প্রাণদণ্ড হবে এখন। এই শয়তানরা আমাকে নির্মমভাবে হত্যা করবে। পরক্ষণেই আবার মুক্তির কথাও মনে এলো; কোনো অছিলায় একবার যদি পালাতে পারতাম! কিন্তু না, পালাবার সব পথই বন্ধ। চারিদিক সমুদ্রে ঘেরা। সামনে-পেছনে সর্বত্র গহন অরণ্য আর ছোট-বড় পাহাড়।

শেষ পর্যন্ত গণেশের পিছু পিছু বেরিয়ে এলাম। জঙ্গল ভেদ করে এগোলাম ধীরে ধীরে। তখনও প্রফেসার সরখেল-এর পরিচয় কিছুই জানি না। এমনকি এই নির্জন দ্বীপে আর কেউ বসবাস করে কিনা, সে সম্বন্ধেও কোনো ধারণা নেই আমার।

এদিকে মিনিট কয়েকের মধ্যেই পৌঁছে গেছি, দারুণ রাশভারী এক মানুষের সামনে। উনি আমাকে যেন দেখেও দেখলেন না। কেউ এসেছে, এ-ব্যাপারে যেন আদৌ কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই ওঁর।

কিন্তু আমি ওঁকে চিনলাম। আলো-আঁধারির অস্পষ্টতার মধ্যেও দিব্যি ধারণা হল আমার, এই সেই লোক, দ্বীপে নামবার পর থেকেই আমি যাঁর হাতে বন্দী।

গত তিন দিন এখানে বন্দী-জীবন যাপন করছি। গণেশ ছাড়া আর কোনো মানুষ দেখি নি। কিন্তু তাতেই বা কী? লোকটাকে তাই বলে এত সহজে ভুলে যাবো?

অবশ্যি এখানে তিনি ভিন্ন মূর্তিতে। কী একটা জিনিস হাতে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। থেকে থেকে ঝুঁকে পড়ছেন তার উপর।

খানিক বাদে, তিনি আমার দিকে তাকালেন।

—আপনিই শিবেন বাগচী?—প্রথম প্রশ্নেই রীতিমত চমকে দিলেন আমাকে।

বললাম,—ঠিকই ধরেছেন।

—মানুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, উদ্ভব ও বিকাশের ধারা নিয়ে গবেষণা করেন? আপনি আনথ্রোপলজিস্ট্, কেমন? তা-ই না?

—ধরুন না কেন, তা-ই।

—হেঁয়ালি করবেন না, স্পষ্ট জবাব দিন।

—দিচ্ছি। বলুন কী জানতে চান?

—এখানে এসেছেন জারোয়াদের সম্পর্কে জানতে। কী? ঠিক কিনা?

—নিশ্চয়ই ঠিক। এছাড়া এ-অঞ্চলে আসবার আর কী কারণ থাকতে পারে?

—কিন্তু আপনি যদি জারোয়াদের চেয়েও অনেক বেশী রহস্যময় প্রাণী দেখতে পান?

—যদি পাই তো নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো।

বেশ, তাহলে আমার কাছে আসুন। এ-জিনিসটার ভেতর দিয়ে দূর-আকাশের দিকে তাকান।—বলেই যন্ত্র-মতো কী যেন তিনি আমার হাতে গছিয়ে দিলেন।

আমি ওটা হাতে নিয়ে উসখুস করছি, এমন সময় ওঁকে বলতে শোনা গেল,—দেখুন, আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। বিশ্বজগতের কোথায় কী জীব ছড়িয়ে আছে, কোন্ জীবের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য, তা নিয়ে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

লোকটা বলে কী? আমি তখন দস্তুরমত স্তম্ভিত। বাক্‌শক্তি পর্যন্ত হারিয়েছি; ওঁর এই অদ্ভুত অনুরোধের কোনো জবাবই খুঁজে পাচ্ছি না।

উনি আমার অবস্থা আঁচ করে থাকবেন; কারণ পরক্ষণেই তাঁর বিবৃতি,—তাকান এই যন্ত্রটার ভেতর দিয়ে। সব কিছু নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। কী জানেন, আপনাকে দেখাবো, গ্রহান্তরের জীবদের সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনবো, সেজন্যেই এই উদ্যোগ-আয়োজন, এত কষ্ট দিয়ে আপনাকে আনা।

এইবার দারুণ সন্দেহ হল আমার। সেইসঙ্গে কৌতূহলও বড় কম নয়। ভাবলাম, যা পাল্লায় পড়েছি, হুকুম তামিল না করে কোনো উপায় নেই। অতএব একবার দেখাই যাক না পরখ করে, কী বলতে চায় লোকটা।

দেখলাম, আশ্চর্য সব দৃশ্য। অদ্ভুত! অবিস্মরণীয়! জিনিসটার ভেতর দিয়ে কোনো এক নক্ষত্রকে তাক করলাম প্রথমে। চেনাজানা নক্ষত্র নয়; সম্পূর্ণ অচেনা একটা। ভালো করে তাকাতেই দেখি, বিরাট সে, বুঝি আমাদের সূর্যের চেয়েও আকারে অনেক বড়। তাকে প্রদক্ষিণ করছে অসংখ্য গ্রহ। আমাদের সৌর-পরিবার কতটুকু আর! বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র গ্রহ ও তাদের উপগ্রহকে নিয়ে তার সংসার। উপগ্রহরা ঘুরপাক খাচ্ছে

গ্রহের চারদিকে ; আর গ্রহ সেইসব উপগ্রহদের সঙ্গে নিয়ে সূর্য-প্রদক্ষিণে ব্যস্ত। যেমন আমাদের চাঁদ ; পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। আবার পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারপাশে।

আমার দেখা এই নক্ষত্র বা সূর্যটির বেলায় কিন্তু ভারী মজার ব্যাপার। এর উপগ্রহেরও উপগ্রহ আছে। অর্থাৎ আমাদের চাঁদের চারদিকে কয়েকটা খুদে খুদে চাঁদ ঘুরপাক খেলে যা দাঁড়ায়।

শুরুতে পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি গ্রহকেই বেছে নিলাম। আহা! কী সুন্দর সে! শত শত চাঁদ তার আকাশপথে সারাক্ষণ আসা-যাওয়া করছে। সেই চাঁদগুলোর চারপাশে ঘুরছে খুদে খুদে অসংখ্য চাঁদ। যেন মেলা ওদের ; আকাশের বুকে চলমান অগুনতি নাগর-দোলায় প্রতিটি যাত্রীই চাঁদ।

ভাবলাম, গ্রহটিতে জীব আছে কিনা প্রথমে দেখি। চাঁদের খবর পরে নিলেও চলবে। কিন্তু না, জীবের কোনো চিহ্নই ওখানে নেই। তামাম গ্রহটা জুড়ে শুধু আগ্নেয়গিরি। সজীব ওরা, প্রতিটিই জীবন্ত ; অবিরাম অগ্ন্যুৎপাত করছে।

এবার ভিন্ন এক নক্ষত্রের দিকে তাকাই। না, এর গ্রহ বা উপগ্রহ কিছুই নেই। এ যেন মরুভূমির বুকে নিঃসঙ্গ যাত্রীর মতো।

এইরকম আরও কয়েকটি নক্ষত্র বা সূর্যকে দেখলাম। এরপর, হঠাৎ যেন ভোজবাজি। দেখি, একটি সূর্যকে ঘিরে প্রায় আমাদেরই মতো এক পৃথিবী। জল আছে সেখানে, বাতাস এবং গাছপালা আছে। গাছগুলো বিরাট ; পৃথিবীর যে কোনো বড় গাছের তুলনায় আট-দশ গুণ। এ ছাড়া জীবরাও কম যায় না ; উচ্চতায় গাছগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে! ঐ জীবদের সঙ্গে মানুষের কিছুটা মিল! তফাতের মধ্যে শুধু এই যে, ওদের দুপাশে দুটো ডানা। তা মেলে ওরা উড়ছে, ঘুরছে, নিমেষের মধ্যে যেখানে খুশি যাচ্ছে।

ওরা মানুষের তুলনায় আকারে অনেক বড়। বুদ্ধিতেও তা-ই। ওরা রোগ শোক এবং মৃত্যুকে জয় করেছে। মৃত্যু বলতে ওরা

বোঝে, পাখা মেলে নতুন কোনো নক্ষত্রলোকের দিকে যাওয়া এবং কোনোদিন আর ফিরে না আসা। যাওয়ার ব্যাপারটা যাত্রীই ঠিক করবে, অন্য কারও জবরদস্তি সেখানে অচল। যাত্রীর যখন মন টেকে না আর, ঐ পৃথিবীর একঘেঁয়ে পরিবেশে সে হাঁপিয়ে ওঠে, তখনই এই মহাপ্রস্থানের প্রশ্ন; ওদের ভাবভঙ্গি এবং কাজ-কারবার দেখে এ আমি স্পষ্ট অনুভব করেছি।

আশ্চর্য! আমাদের পৃথিবীকে দেখার যন্ত্র বহু আগেই ওরা আবিষ্কার করেছে। এমনকি আমি যে ওদের দেখছি, তাও ওখানকার কেউ কেউ ধরে ফেলল। একজন তো আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়েই দিল, আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে ওদের তফাৎ কোন্‌খানে।

এইরকম আরো কিছু দেখলাম—অদ্ভুত জীব, আশ্চর্য জগৎ। এক জায়গায় দেখি, সরু সরু কিছু যন্ত্রপাতি, হাঁটছে, চলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে অনেকটা মানুষের কঙ্কালের মতো।

সে-দেশে যন্ত্র শুধুই। চারিদিকে বিরাট বিরাট সব কল-কারখানা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। দেশটিকে দেখে মনে হল, যন্ত্র-সভ্যতায় খুবই উন্নত সেখানকার জীবরা; তবে জীবধর্ম ওদের মধ্যে খুব সামান্যই। যন্ত্রের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে গিয়ে ওরা নিজেরাই যন্ত্র বনে গেছে। কেউ কোনো কথা বলে না, বোতাম টিপে সংকেতে সব বোঝায়। হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ কিছুই ওদের নেই, শুধু কাজ আর কাজ। নিমেষের মধ্যে ওরা বিরাট বিরাট সব কল-কারখানা গড়ে তুলছে, সেগুলোকে ভাঙছে, আবার নতুন করে গড়ছে। ওদের আদৌ কিছু মায়া-মমতা আছে, মনে হয় নি। চলতে চলতে কোনো জীব হয়তো বা পড়ে গেল, কা'রও ভ্রূক্ষেপই নেই। কোত্থেকে একটা যন্ত্র ছুটে এলো, তাকে কুড়িয়ে নিয়ে চলল তৎক্ষণাৎ।

যাবে কোথায়? হাসপাতালে? অনুসরণ করতে গিয়ে দেখি, না, সে বালাই নেই। গেল কারখানাতে। ওখানে অদ্ভুত আকারের একটা যন্ত্র এসে ঐ জীবটার মাথাকে দেহ থেকে আলাদা করে

নিল। তারপর নতুন একটা যন্ত্র-দেহ জুড়ে দেওয়া হল ঐ মাথার সঙ্গে।

জীবটা চাঙ্গা হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ। কারখানা থেকে নিজেই হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলো। কী বলবো, এ-দৃশ্য দেখে আমি হতবাক। প্রাণের অস্তিত্ব যে অনুভবে, বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায়,—এ জিনিসটা ওরা বুঝে নিয়েছে। তাই ঐ মাথাটা ভিন্ন দেহের সঙ্গে জোড়া হল। জীবটাও নতুন জীবন পেল।

লক্ষ্য করলাম, সে-দেশের জীবরা খুশিমত নতুন দেহ ধারণ করছে। চলতে চলতে থামছে হঠাৎ, যন্ত্র এসে ভিন্ন দেহের ব্যবস্থা করছে।

যন্ত্রদেহগুলোর আকৃতি এক ধরনের নয়। কোনোটো ছোট, কোনোটা আবার লাল।

ওদেশে মৃত্যু বলতে শুধুমাত্র মস্তিষ্কের মৃত্যু, তার কাজ করার অক্ষমতা। মৃত্যু ব্যাপারটাকেও ওরা যান্ত্রিক উপায়ে বোঝায়, দেহের সঙ্গে যুক্ত একটা সোনালী আলো জ্বেলে।

দেখলাম, একজনের বেলায় ঠিক এইরকম ঘটল। সোনালী আলো জ্বলে উঠতেই বিরাট আকারের এক যন্ত্র তুলে নিল দেহটাকে।

আশ্চর্য! কিছুই ওরা নষ্ট করে না। মস্তিষ্ককে পাঠায় আকাশ-উঁচু এক কারখানায়; সেখানে তার অবশেষ কাজে লাগে 'জায়ান্ট ব্রেইন' বা অতিকায় যান্ত্রিক মস্তিষ্ক নির্মাণে। দেহটা ভিন্ন এক কারখানার গুদাম-ঘরে মজুত থাকে। প্রয়োজন হলেই অন্য কেউ ব্যবহার করবে।

না, এই যান্ত্রিক জীবদের ভালো লাগে নি আমার। বরাবর মনে হয়েছে, এরা নির্বোধ, উন্নতির নামে নিজেদের জীবনকে অসুন্দর ও ভয়ঙ্কর করে তুলছে।

এদের থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে অন্য এক জীবলোকের অন্বেষণ করছিলাম, এমন সময় প্রফেসার সরখেল বাঁধা দিলেন,—আজ থাক, আর একদিন।

কিন্তু আমাকে তখন নেশায় পেয়েছে। নতুন নতুন জীবলোক দেখার মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। তাই প্রফেসারকে অনুরোধ করলাম,—যদি আপনার তেমন আপত্তি না থাকে তো—

প্রফেসার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—না না, আজ আর নয়। অনেক দেখেছেন; অনেক কিছু অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন। একদিনে বেশি দেখলে সব জট পাকিয়ে যাবে। কী দেখতে গিয়ে শেষকালে কী বলবেন!

কথাটা মিথ্যে নয়। আমি দেখছিলাম, আর অনর্গল বলে যাচ্ছিলাম। কারণ, প্রফেসারের সেরকম নির্দেশ ছিল.—যা কিছু দেখবেন, তার হুবহু বর্ণনা দেবেন যেন। সব আমি নোট করবো।

তা নোট তিনি করেছিলেন। ওঁর দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, মিট মিট করে একটা আলো জ্বলছে। উনি সেই আলোর সামনে কাগজ ও কলম নিয়ে বসে।

সেই থেকে আমাকে নেশায় পেল। প্রফেসার সরখেল-এর ঐ যন্ত্রটির ভেতর দিয়ে তাকাবার আশায় সারাক্ষণ আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম।

অবশ্য প্রফেসারও সুযোগ দিয়েছিলেন। একদিন নয়, পর পর কয়েকদিন। প্রতিবারেই এক ব্যবস্থা। আমি দেখছি, অভিজ্ঞতার কথা বলছি, আর প্রফেসার তো নোট করছেন।

কী যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার, শুনলে কেউ কি বিশ্বাস করবেন? এমন উন্নত জগতও আমি দেখেছি, যেখানকার জীবদের দেহ বলতে কিছু নেই; বিন্দু বিন্দু আলোক ওরা. শুধুমাত্র বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সমষ্টি।

ঐ আলোকগুলোই যে জীব তা কী করে জানলাম? আশ্চর্য! ওরা নিজেরাই তা বুঝিয়ে দিল। আমি ওদের দেখছি, লক্ষ্য করে আমার চোখ মারফত বার্তা পাঠাল। থট রিডিং-এর সাহায্যে এমনকি আমার মনের কথাও ওরা জেনে নিল।

ওদের ভাবভঙ্গী বড় অদ্ভুত। যে কোনো সময় আলোকের বেগে ছুটতে পারে। অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে পাড়ি দিতে পারে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। এছাড়া, মনের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়াটা ওরা বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছে। যেন কোটি কোটি ছায়াপথের ব্যবধানও কিছুই নয়।

ছায়াপথ কী, জানেন নিশ্চয়। দূরবীনে আজ অবধি যে একশো কোটি ছায়াপথ চোখে পড়েছে তাও নিশ্চয় আপনাদের অজানা নেই।

এই সংখ্যাটি কিন্তু আসলে ভুল। প্রকৃতপক্ষে ছায়াপথ আছে একশো কোটি কোটি কোটির চেয়েও বেশি। এদের প্রত্যেকটিতে আবার কোটি কোটি নক্ষত্রের মেলা। আমাদের পৃথিবী এবং সূর্য যে ছায়াপথে, তাঁকে আমরা 'মিল্‌কি ওয়ে' বলে থাকি। এতে যে কত হাজার হাজার কোটি নক্ষত্র বা সূর্যের কোটি কোটি ঝাঁক আছে তা বলে বোঝানো দুরূহ। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের ছায়াপথটির নাম ম্যাগেলানিক ক্লাউড। এটি আছে পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ আলোক-বৎসর দূরে। অর্থাৎ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুটে ঐ ছায়াপথ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে দু লক্ষ বছর সময় লাগে। অ্যাণ্ড্রোমিডা ছায়াপথটির দূরত্ব পৃথিবী থেকে বিশ লক্ষ আলোক-বৎসর।

এখানে হঠাৎ আণ্ড্রোমিডার কথা বলছি, কারণ অতি উন্নত ঐ জীবরা, যারা আলোকবিন্দুবিশেষ, তারা এই ছায়াপথেরই বাসিন্দা। এর কোটি কোটি, কোটি কোটি সূর্যের মধ্যে কদাচিৎ কোনো কোনোটিকে প্রদক্ষিণ করছে জীব-অধ্যুষিত পৃথিবী। ঠিক এইরকম এক পৃথিবীতেই ঐ প্রাজ্ঞ জীবদের আবাস। ছায়াপথটির নাম ওরাই আমাকে জানিয়ে দিল। থট রিডিং-এর সাহায্যে আমাদেরই দেওয়া নামে নিজেদের নক্ষত্রপুঞ্জের পরিচয় দিল ওরা। দিল তার কারণ, আমার যাতে না বুঝতে অসুবিধে হয়।

না না, অসুবিধে কিছু হয় নি। তবে ওদের ভাবনা-চিন্তার

সঙ্গে পরিচিত হবার সময় অদ্ভুত এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছিল আমার চোখে, মুখে, মস্তিষ্কে। আমি ক্রমেই যেন দিশেহারা হয়ে পড়ছিলাম।

কিন্তু এ তো গেল উন্নত জীবদের কথা। এ ছাড়া অনুন্নতদেরও দেখেছি। ওরা নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর, আদিম। সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। ওদের মুখের আদল অনেকটা গুহামানবদের মতো। তবে দেহের আকার বিরাট।

ওরা বড় বড় গাছ উপড়ে তুলে লড়াই করছে। কখনও বা ছোটখাটো এক-একটা পাহাড় ছুঁড়ছে পরস্পরের দিকে। দেখতে দেখতে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে ওদের দেহ। কেউ বা হচ্ছে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। লড়াই থামাবার কোনো লক্ষণই নেই। যেন কেউ দিব্যি দিয়েছে, লড়াই না করলেই নয়। অথবা যেন ওদের দেহে বাড়তি শক্তির জোয়ার। খানিকটা অপচয় না করলে কি চলে ?

অদ্ভুত ওদের জীবনীশক্তি। লড়াই করতে করতে কা'রও হাত দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল। কা'রও বা পা কিন্তু ওদের কোনো হুঁশই নেই যেন। বিকৃত দেহ নিয়েই লড়ছে। কখনও বা দেহের খসে-পড়া টুকরোগুলোকে ছুঁড়ছে শত্রুপক্ষকে তাক করে।

কী ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য ! দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠলাম। ভিন্ন সব জগতের অন্বেষণ করলাম।

হ্যাঁ, দেখেছি। মানুষের সঙ্গে আদৌ কোন সাদৃশ্য নেই, এমন জীব-অধ্যুষিত জগৎও অনেক দেখেছি। এছাড়া জীবহীন নিষ্প্রাণ জগৎ দেখছি শত শত। কিন্তু তাদের কথা এখানে বলবো না। কারণ, প্রফেসার সরখেল জীব-অধ্যুষিত জগতের দিকে, বিশেষ করে যে সব জগতের জীবদের সঙ্গে মানুষের কমবেশি সাদৃশ্য আছে তাদের দিকেই নজর রাখতে বলেছিলেন এবং আমিও তা-ই রেখেছিলাম

অবশ্য অস্বস্তি হচ্ছিল খুবই। চোখ দুটোর জ্বালা-যন্ত্রণা দিন দিন বাড়ছিল। এ নিয়ে প্রফেসার সরখেলকে একদিন বললাম। কিন্তু উনি মোটে আমলই দিলেন না। বললেন,—ও কিছু নয়। দূরের জিনিসের দিকে এক নাগাড়ে তাকালে অমন হয়েই থাকে।

কিন্তু ওঁর কথা ঠিক মেনে নিতে পারিনি। বরং সন্দেহ করেছি, যন্ত্রটা দিয়ে নিজে না দেখে প্রফেসার কেবল আমাকে দেখতে দেন কেন?

শেষ অবধি সন্দেহের নিরসন হয়েছে। আমার অনুরোধে যন্ত্রটার ভেতর দিয়ে দু-একদিন উনি তাকিয়েছেন। কিন্তু হায়! তখন কি জানতাম, এটা ওঁর ভাঁওতা! তাকাবার অছিলা করে চোখ বুজে আছেন প্রফেসার!

এদিকে দেখতে দেখতে আমার চোখ খারাপ হল। মাস খানেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলাম। তখন প্রফেসার নিজেই একদিন তাঁর জীবনের সব কথা আমাকে খুলে বললেন। দূর-আকাশকে ঘিরে তাঁর বিপজ্জনক গবেষণারও লম্বা ফিরিস্তি দিলেন। সে সব আগেই আপনাদের বলেছি। যা নাকি বলা হয় নি এখনও—

আবার বাধা এইখানে। শিবেন বাগচীর বিবৃতির মাঝখানে হঠাৎ সাময়িক ছেদ। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। খুব ধারে-কাছেই যেন।

হঠাৎ কান্নার শব্দে অশেষ ও ডঃ মুখার্জী ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। শিবেন বাগচীও স্তব্ধ। তাই পরিবেশ দেখতে দেখতে আরও ভয়াল ও থমথমে হয়ে উঠল।

শেষ অবধি নীরবতা ভাঙল অশেষ,—কে? কে ওখানে? অমন করে কাঁদছে কেন?

শিবেন বাগচী বুঝিয়ে দিলেন,—কান্নাটা আমার বন্ধু ডঃ অমল চক্রবর্তীর। পাশেই বাগিচা থেকে আসছে। বেচারী পাগল হবার পর থেকে হামেশা ওরকম করে।

ডঃ মুখার্জী বললেন,—হ্যাঁ, মনে পড়ছে। অমলবাবুর কথা বলেছিলেন বটে। আপনার বিশিষ্ট বন্ধু, অ্যানথ্রোপলজিস্ট্। জারোয়াদের নিয়ে গবেষণা করবেন বলে একই সঙ্গে আপনারা এই দ্বীপে আসেন। কিন্তু উনি পাগল হলেন কী করে?

শিবেন বাগচী বললেন,—সব কি ছাই আমিই জানি। তবে অনুমান, প্রফেসার সরখেল এর মূলে।

উনি বুঝি অমলবাবুকেও নতুন নতুন সব জগৎ দেখতে বাধ্য করেছিলেন?—অশেষ-এর কৌতূহল আকাশছোঁয়া।

অবশ্য ডঃ মুখার্জীও কম যান না। অশেষ-এর প্রশ্নের জবাব মেলার আগেই নতুন প্রশ্ন তাঁর,—অমলবাবুও কি অন্ধ? ঠিক আপনার মতই?

শিবেন বাগচী জানান,—হ্যাঁ, প্রায় আমার মতো। নতুন নতুন জগৎ দেখার খেসারৎ দিচ্ছেন। তবে ওঁর ব্যাপারটা একটু বুঝি বেশি জটিল। খোলসা করে না বললে ঠিক বুঝবেন না।

এই বলে শিবেনবাবু থামেন একটু। কান্নার আওয়াজটা থিতিয়ে আসবে আশায় মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করেন।

না, তখনও ঠিক থামেনি। থেকে থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। যেন ঘুমের ঘোরে কেউ দুঃস্বপ্ন দেখছে। চীৎকার করছে খানিক বাদে বাদে।

আরও মিনিট কয়েক অপেক্ষার পর যখন তা প্রায় থেমে এল, তখন শিবেন বাগচী নতুন করে শুরু করলেন,—এখানে আসার পর থেকে একদিন মাত্র অমল-এর দেখা পাই। তখন সে নিজেই আমায় সব বলেছিল। এখানে, এই ঘরেই বলেছিল।

—কী বলেছিল?—অশেষ অস্থির। একসঙ্গে সব কিছু জানতে চায়। শিবেন বাগচী তাকে আশ্বস্ত করে জানান,—বলছি। বলবো। তার আগে ধৈর্য ধরুন একটু। এখানে আমাদের বসবাসের পটভূমিকা জেনে নিন।

অমল ও আমি থাকতাম আলাদা জায়গায়। একের সঙ্গে অপরের দেখা হবার সুযোগ ছিল না। বলা বাহুল্য, প্রফেসার সরখেল নিজের স্বার্থেই এ-ব্যবস্থা করেছিলেন, যা'তে না আমরা একে অপরকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা জানাবার সুযোগ পাই।

কী জানেন, আমি আর অমল একই সঙ্গে প্রফেসারের কাজে লাগলাম।

এ দ্বীপের একই জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমাদের দিয়ে পর্যবেক্ষণ চালানো হল।

অমল-এর অভিজ্ঞতা বড় বিচিত্র। ঘটনাচক্রে এমন এক জগতের ও সাক্ষাৎ পায় সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে ও মহিমায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা অতুলনীয়। যা কিছু সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ বলে আমরা মনে করি, তার সবই সেখানে আছে।

সেখানকার নদীর জল স্ফটিক-স্বচ্ছ। জলের নীচে নুড়ি বা মাটি নেই, রাশি রাশি মণিমুক্তো শুধু। নদীর দুধারে কত কী ফুলের বাহার! কত রঙ্-বেরঙের! আর ফুলগুলোও কত বড়! যে কোন একটাকে টেনে নিয়ে মাথায় ধরলে চাঁদোয়ার কাজ করবে।

ফুলের মাঝে মাঝে অপরূপ সব গাছ। এক-একটার পাতা এক-এক রঙা। বড় অদ্ভুত। একটার সঙ্গে অন্যটার রঙের কোন মিলই নেই। সবই সতেজ সেখানে। সরস, প্রাণময়। কোথাও জীর্ণতা বা মালিন্যের ছিটে-ফোঁটা নেই। এমনকি খাড়া পাহাড়ের চূড়া অবধি ফুলের মেলা। কদাচিৎ যেখানে ফুল নেই, সেখানে সোনার ঝলমলানি। পাহাড়গুলো সবই সোনায় গড়া।

এছাড়া, রূপোও অফুরন্ত, মাঠে-ময়দানে। রূপোর এক-একটা বেদীকে ঘিরে ফলন্ত গাছ, অদ্ভুত সতেজ আর সুন্দর। এত ফল সেই সব গাছে যে, পাতা চোখে পড়ে না।

সারাক্ষণ সর্বত্র আলোর মহোৎসব। কিন্তু কী আশ্চর্য। চোখে

জ্বালা ধরে না। সে দেশে ধুলো নেই, কোলাহল নেই, উত্তেজনা নেই, অশান্তি নেই। সর্বত্র তৃপ্তি, পবিত্রতা, আনন্দ।

সেখানকার যত্র-তত্র ফোয়ারা—আকাশ-উঁচু। ফোয়ারা থেকে নক্ষত্রের মতো কী সব ছিটকে বেরোচ্ছে। বেরিয়ে দেখতে দেখতে আকাশের বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সে-দেশের আকাশটাও কী সুন্দর! কত রঙ্-বেরঙের নক্ষত্র সেখানে! কত যে বিচিত্র আলোর খেলা! থেকে থেকে রঙ্-বদল হচ্ছে আকাশের। নানা জাতের আলোর ঝালর দুলতে দুলতে ভাসতে ভাসতে রূপের মায়াজাল সৃষ্টি করছে।

কিন্তু সে দেশে প্রাণী কোথায়? কেউ কি নেই সেখানে?

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ অমল-এর চোখে পড়ে, যীশুখ্রীষ্টের মতো কে যেন ধীর শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন।

খানিক বাদেই গৌতম বুদ্ধের মতো একজনের দেখা মিলল। তিনিও চলেছেন। কিন্তু কোথায়, কোন্‌দিকে—ঠিক বুঝবার উপায় নেই।

এইরকম আরও অনেককেদেখল অমল, পৃথিবী যাঁদের পাদস্পর্শে একদিন ধন্য হয়েছিল।

কী আশ্চর্য! অমল ভেবে পায় না,—মহাপুরুষরা সবাই এখানে? এই কি তবে স্বর্গ?

আকাশ-পাতাল সে ভাবছে, এমন সময় ঐ অদ্ভুত জগৎ থেকে কে যেন ইঙ্গিত করল,—চলে এসো। আর দেরি কেন?

অমল মনে মনেই জবাব দিল,—কিন্তু কী করে যাই? কোটি কোটি আলোক-বর্ষের যে ব্যবধান! ইচ্ছে থাকলেও যাবার যে উপায় নেই!

—হ্যাঁ, আছে উপায়—বহুদূরে কোটি কোটি ছায়াপথের ওপার থেকে কার যেন ইঙ্গিত,—ইচ্ছা থাকলেই আছে।

অমল বললো,—কিন্তু তোমরা যে ওখানে আছ, তার প্রমাণ? এমনও তো হতে পারে, তোমাদের জগৎ লক্ষ লক্ষ বছর আগে ধ্বংস

হয়ে গেছে। আজ আমি যা দেখছি, তা মিথ্যে। তোমাদের জগতের আলো এতদিন বাদে আমার কাছে এসে পৌঁছুল। তাই আজ তোমাদের দেখা পেলাম।

—তা কখনও হয় ?

—কেন হবে না ? বিশ্বভুবন জুড়ে প্রতি মুহূর্তে পুরাতন নক্ষত্র ধ্বংস হচ্ছে। নতুন সৃষ্টি হচ্ছে। এমন কত নক্ষত্র আমরা দেখি, যারা বহু কোটি বছর আগে থেকেই নেই। আমরা এখনও যে তাদের দেখি, তা শুধু আলোর দৌলতে। ওদের আলোক সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ছুটে এসে দীর্ঘদিন বাদে আমাদের কাছে পৌঁছয় বলে। আমরা যে তাদের থেকে কোটি কোটি কোটি কোটি মাইল দূরে।

—কে বললো, দূরে ? এইসব মনগড়া কথা তোমায় কে শেখাল ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছুই হারায় না। সব আছে, ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। না থাকলে আমরাই বা তোমাকে দেখলাম কী করে ?

এর পর থেকে অমল বহুবার অন্বেষণ করেছে সে জগৎ। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আর সে তাকে খুঁজে পায় নি।

এদিকে প্রফেসার সরখেল বিরক্ত। বার বার অমলকে শুধিয়েছেন, —হল কী ? এত কী খুঁজছেন ? নতুন আর কোন জগৎ কি চোখে পড়ছে না ?

অমল এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেয় নি। কারণ, সে তখন মরিয়া। স্বর্গোপম ঐ জগৎ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নেশায় ধরেছে তাকে।

সরখেল-এরও দোষ নেই। কারণ যখন যে জগৎ অমল-এর চোখে পড়বে, বিশেষ করে জীব-অধ্যুষিত জগৎ চোখে পড়বে, সে তখন তার বর্ণনা দেবে, এই ঠিক ছিল। প্রিয় জগৎটির মোহে পড়ে অমল বর্ণনা দিতে ভুলে যাচ্ছিল। আর কোনো জগৎ ওর মনেই ধরছিল না।

প্রফেসার সরখেল শেষ পর্যন্ত রীতিমত অধৈর্য হয়ে উঠলেন। প্রচণ্ড ধমক দিলেন অমলকে,—এর মানে কী, ডঃ চক্রবর্তী, আমি জানতে চাই? শুধু খুঁজেই চলেছেন, কিছু বলছেন না। কী মতলব আপনার?

অমল নিরুপায় এবার। সবিনয়ে বললো,—না না, মতলব-টতলব কিছু নেই। তবে কী জানেন, অদ্ভুত এক জগতের সন্ধান পেয়েছি। সেই জগৎকে খুঁজছি।

প্রফেসার গর্জে উঠলেন,—খুঁজে লাভ? আর কি তাকে পাবেন?

অমল আর্তনাদ করে উঠলো,—কেন পাবো না?

প্রফেসার সরখেল বুঝিয়ে দিলেন—পাবেন না, তার কারণ, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সূর্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। সেইসব সূর্যের অল্প কয়েকটিকে ঘিরেই জীবজগৎ সম্ভব। ঘটনাচক্রে কোনো বিশেষ মুহূর্তে যে জগতের সন্ধান পেলেন ক্ষণকাল পরে সে জগৎ দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, কোটি কোটি ছায়াপথের অংশীদার অগণিত সূর্যদল এক জায়গাতে স্থির হয়ে তো বসে নেই। তারা চলছে, ছুটছে, জগৎ-প্রদক্ষিণ করছে। সৌর পরিবারের অন্তর্গত পৃথিবীগুলোও চুপচাপ বসে নেই। সূর্য-প্রদক্ষিণের সঙ্গে জগৎ-পরিক্রমায় ব্যস্ত। এতএব, ভেবে দেখুন একবার, বহুদূরের কোনো ছায়াপথের ভেতর থেকে বিশেষ কোনো সূর্যকে খুঁজে বের করে তার অন্তর্গত নির্দিষ্ট পৃথিবীটিকে খুঁজে বের করা কত কঠিন কাজ।

অমল চীৎকার করে উঠল,—না না, পৃথিবী সে নয়, স্বর্গ আমি তাকে নিজের চোখে দেখেছি।

প্রফেসার সরখেল প্রতিবাদ করেন,—কী বলছেন, যা খুশি তা-ই? স্বর্গ কি আলাদা কোথাও? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবটাই স্বর্গ।

—না, আমি তা মানতে রাজী নই।—অমল-এর প্রতিবাদ,—নিজের চোখে যা দেখেছি, এত সহজে তা ভুলে যাই কী করে? কী করেই বা তা অস্বীকার করি?

—স্বীকার-অস্বীকারের প্রশ্ন নয়—প্রফেসার সরখেল বোঝাবার চেষ্টা করেন, সবটাই আপনার মনের ভুল। স্বর্গের অস্তিত্ব আপনি মনে মনে কল্পনা করেছেন।

এর পর থেকে মনের কারসাজিই বড় হয়ে উঠল। শয়নে-স্বপনে অমল-এর শুধু একটাই চিন্তা—সেই স্বর্গলোকের।

ঠিক এই যখন ওর মনের অবস্থা, তখন একদিন ও আমাকে সব খুলে বলে।

কথাবার্তার সময় আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করি, বারবার খেই হারিয়ে ফেলছে ও। এমন সব অলীক কল্পনায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছে যাদের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। মনে হল, এইভাবে আরও কিছুদিন চললে ও আর নিজেকে সামলাতে পারবে না, উন্মাদ হয়ে যাবে।

অবশ্য তখন আমার অবস্থাও যে খুব ভালো তা নয়। দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে, কিছুই ঠিক ভালো দেখছি না। অমলকে দেখছিলাম ঝাপসা অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তির মতো; যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়ছে, অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলছে।

অমল-এর অবস্থা আরও শোচনীয়। সে তখন সম্পূর্ণ অন্ধ; পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বসে আছে। আমাকে সে ঠাওর করল কণ্ঠস্বর শুনে। এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে একবার দেখলও। গায়ে মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে যেন বুঝে নিতে চাইল, পুরনো বন্ধুই তার সামনে দাঁড়িয়ে কিনা।

আমি তাকে বারবার বোঝাতে চাইলাম,—অমল, আর দেরি নয়, চলো, এবার পালাই। এখানে এই শয়তানের রাজত্বে বেশিদিন থাকলে আমাদের আরও ক্ষতি হবে।

—ক্ষতি? শয়তানের রাজত্ব! এসব কী বলছো তুমি?—অমল

আমার কথার প্রতিবাদ করে,—যে রাজত্বের সন্ধান আমি পেয়েছি, সাত রাজার ধন-মাণিক হাতে পেলেও তা কি ছাড়া যায়?

বুঝলাম, কিছুতেই ওকে শান্ত করা যাবে না। ও এখন যুক্তিতর্কের বাইরে। কিন্তু তবু চেষ্টা করতেও ছাড়িনি। বোঝাতে চেয়েছি,—ছাখ অমল, বাজে তর্ক করে লাভ নেই। আগে পালিয়ে বাঁচি, তারপর অন্য সব বিষয় নিয়ে ভাবা যাবে।

অমল আমার কথার জবাবে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ কোত্থেকে আমাদের কথাবার্তা শুনে গণেশ ছুটে এলো। দুই বন্ধুকে আলাদা করে দিল তৎক্ষণাৎ।

এর পর থেকে অনেক খোঁজ করেছি অমলের। কিন্তু ঐ কান্না ছাড়া আর কিছু শুনতে পাই নি।

অশেষ বললো,—আমাদের আগ্রহ শ্যামল হাজরা সম্পর্কে। বিশেষরকম আগ্রহ। ওঁর কথা কিছু বলুন।

শিবেন বাগচী নতুন করে শুরু করেন,—ডঃ হাজরাকে দুদিন মাত্র কাছে পেয়েছি। এই বদ্ধ ঘরেই তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়, এখানেই বিচ্ছেদ।

—অর্থাৎ?—ডঃ মুখার্জী মুখ খোলেন এবার। প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে অস্বাভাবিক কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

শিবেন বাগচী ওতে কান দেন না। একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে আপন মনেই বলতে থাকেন,—গণেশ একদিন অমল ও ডঃ হাজরাকে এই ঘরে পৌঁছে দেয়। কারণ, সেদিন পুলিশের উৎপাত। তামাম দ্বীপটিকে চারিদিক থেকে ওরা ঘিরে ফেলেছে। এক জায়গায় আমাদের রাখার উপায় ছিল না।

—সেদিন ডঃ হাজরার সঙ্গী দুই উদ্ভিদবিজ্ঞানীও কি এই ঘরেই ছিলেন?—অশেষ-এর প্রশ্ন।

—না, ওঁরা কেউ ছিলেন না।—শিবেন বাগচীর সরল নিরুত্তাপ জবাব,—কেননা, আগেই ওদের দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

—মৃত্যু! কী করে?—ডঃ মুখার্জীর কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত, দুঃখ ও বেদনায় বিকৃত।

শিবেন বাগচীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ধীর শান্ত কণ্ঠে তিনি বলতে থাকেন,—প্রফেসার সরখেল-এর পাল্লায় পড়ে ওঁরা দুজন আগেই চোখ হারান। শ্যামল হাজরার চোখ তখনও পুরোপুরি নষ্ট হয় নি—হচ্ছে, হতে চলেছে।

এই যখন অবস্থা, তখন একদিন কী করে যেন ওঁরা তিন সঙ্গী একত্র হলেন। ঠিক হল, আর এক মুহূর্তও নয় এখানে, যেমন করে হোক পালাতে হবে।

কিন্তু কোথায় কোন্ দিক দিয়ে পালাবেন? দ্বীপটীর ভেতরে ছোট-বড় পাহাড় এবং জঙ্গল। বাইরে চারিদিকে সমুদ্র।

ডঃ হাজরা পরামর্শ দিলেন, আপাততঃ সমুদ্রের তীরে পৌছুন যাক। তারপর বুনো গাছ-গাছড়া দিয়ে ভেলা গোছের যা হোক কিছু একটা গড়তে হবে। ভয় নেই ওঁদের, ওঁর নিজের দৃষ্টিশক্তি এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তা দিয়েই কাজ চলবে।

এগিয়ে চললেন ওঁরা, দুর্গম অরণ্যের ভেতর দিয়ে। কোথাও আবার উঁচুনীচু পাহাড়, ঝোপঝাড়ে আচ্ছন্ন। ডঃ হাজরা সাধ্যমত সাহায্য করলেন ওঁর সঙ্গীদের। কিন্তু হাজরার শক্তিই বা কতটুকু! নিজে চোখে কম দেখেন। তার উপর তখন আবার সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছিলেন ওঁরা। চলতে চলতে হঠাৎ ওঁর সঙ্গীদের একজনের পা হড়কে গেল। পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়লেন তিনি। দ্বিতীয়জন বিপদ ডেকে আনলেন সহযাত্রীকে সাহায্য করতে গিয়ে। তিনিও পড়ে গেলেন।

ডঃ হাজরা অনেক কষ্টে সহযাত্রীদের খুঁজে বের করেছিলেন। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। কেউ ওঁরা বেঁচে নেই।

কী জানেন,—শিবেন বাগচী বলতে লাগলেন,—শ্যামল হাজরা তাঁর এইসব মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা নিজেই আমাকে বলেছিলেন।

—আচ্ছা,—ডঃ মুখার্জী জানতে চান,—শ্যামল-এর কি অমলবাবু-ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা হয় ?

—কী জানেন !—শিবেন বাগচীর স্পষ্ট জবাব,—কিছু বলতে পারবো না। কারণ, সে-সব কথা ওঠার আগেই গণেশ এসে ডঃ হাজরাকে আমার কাছ থেকে আলাদা করে দেয়।

অবশ্য প্রফেসার সরখেল আমার ওপর মোটামুটি সদয়। কারণ, আমি ওঁকে গবেষণায় সাহায্য করেছি; নানাভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। অন্যদের মতো আদৌ কোনো বিরুদ্ধাচরণ করি নি।

হামেশা ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হত; এখানেই হত। কত সময় উনি আমাকে ওঁর মনের কথা খুলে বলতেন। সে-সব আগেই আপনাদের বলেছি। কেমন? তাই কিনা?

ডঃ মুখার্জী সায় দিলেন,—হ্যাঁ, বলেছেন বটে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। প্রফেসার সরখেল ও গণেশ আমাদের বন্দী করার ঠিক পরেই আপনার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিলেন কেন ?

শিবেন বাগচী বললেন,—এর একটাই কারণ, আমার প্রতি ওঁদের আস্থা। ওঁরা এখনও ভাবতেই পারেন না যে আমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে পারি, ওঁদের কার্তিকলাপ ফাঁস করে দিতে পারি।

ডঃ মুখার্জী বললেন,—দেখুন শিবেনবাবু, কিছু মনে করবেন না। কীর্তিকলাপের কথা যা নাকি এতক্ষণ ধরে বললেন, একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তা কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।

—করেন না ? বলেন কী !

—আমার অনুমান, প্রফেসার সরখেল-এর এইসব কাণ্ডকীর্তির পেছনে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য আছে। এমন উদ্দেশ্য যার বিন্দুবিসর্গও আপনি জানেন না।

—কিন্তু তা কী করে সম্ভব ? আমি যে নিজের চোখে সব দেখেছি ! আমার বন্ধু অমল চক্রবর্তী দেখেছে ! সবই কি মিথ্যে হতে পারে ?

—কী জানেন, যা আপনারা দেখেছেন তার সবটাই তখনকার মতো আপনাদের কাছে সত্যি। কারণ, আপনারা তখন ছিলেন সম্মোহিত অবস্থায়। প্রফেসার সরখেল হিপ্‌নোটাইজ করেছিলেন সবাইকে। নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে সবাইকে দিয়ে অসম্ভব জগতের কল্পনায় বাধ্য করেছিলেন।

—কিন্তু কেন তা করবেন? করে ওঁর লাভ?

—লাভ কোথাও না কোথাও নিশ্চয় আছে। আমরা কেউই তা জানি না।

—আপনি কি বলতে চান, উল্কার ব্যাপারটা আসলে বুজরুকি? দূরের জিনিস ওভাবে দেখা আদৌ সম্ভব নয়?

ডঃ মুখার্জী বললেন,—না না, কিছুতেই নয়।

শিবেন বাগচীর আপত্তি,—কিন্তু আমি যে দেখেছি! আর তাছাড়া, দেখতে গিয়ে প্রফেসার সরখেল নিজেই একটি চোখ হারিয়েছেন। গণেশকেও খেসারত দিতে হয়েছে মূল্যবান একটি চোখ। এগুলোর সবই কি মিথ্যে?

ডঃ মুখার্জী বললেন,—দেখুন, ওদের চোখ নানা কারণে নষ্ট হতে পারে। কী সে কারণ তা আপনিও জানেন না, আমিও না। যা আপনি জেনেছেন, তার প্রায় সবটাই সরখেল-এর বর্ণনা থেকে; সে বর্ণনা আগাগোড়া মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ?

শিবেন বাগচী বললেন,—প্রমাণ আমি নিজে, আমার বন্ধু অমল চক্রবর্তী, আপনার বন্ধু শ্যামল হাজরা। সবাই চোখ হারিয়ে বসে আছি, এ তো ঠিক?

ডঃ মুখার্জীর প্রবল আপত্তি,—না না, ঠিক নয়। চোখ আপনারা ভিন্ন কারণেও হারাতে পারেন। এমনও হতে পারে, প্রফেসার সরখেল ইচ্ছে করেই আপনাদের অন্ধ করেছেন। ওঁর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আছে এর পেছনে।

শিবেন বাগচী হতাশভাবে বললেন,—কী জানি! আমার কিন্তু

তা মনে হয় না। বরং মনে হয়, ওঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারটাই ঠিক। গবেষণার তাগিদে ওঁর বিচারবুদ্ধির ঠিক নেই। নিষ্ঠুর, নির্মম ও কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে উঠেছেন উনি।

—কে আবার কাণ্ডজ্ঞানহীন হল? আমি? শিবেন বাগচী? না গণেশ?—বলতে বলতে হঠাৎ ঘরে ঢুকল এক ছায়ামূর্তি।

ডঃ মুখার্জী দেখেই চিনলেন।—এ লোকটিই যত নষ্টের গোড়া। এঁরই হাতে ওরা বন্দী। এঁরই নাম প্রফেসার সরখেল।

দেখুন কাণ্ড! এতক্ষণ এসেছেন, আলাপ-পরিচয় হয় নি। যত্ন-আত্তিই করতে পারি নি। বড় ব্যস্ত ছিলাম।—কাউকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সরখেল একটানা বলে গেলেন।

ডঃ মুখার্জী ও অশেষ স্তব্ধ। এ-কথার কী-ই বা জবাব দেবেন! ওদিকে শিবেন বাগচীর মুখেও কোনো কথা নেই।

শেষ পর্যন্ত সরখেলই মুখ খুললেন আবার। সহকারী গণেশকে ডেকে নির্দেশ দিলেন,—এঁরা সব মান্যগণ্য লোক, আজকের এই দুজন নতুন অতিথি। এঁদের ভালো জায়গায় রেখে খুব ভালোভাবে দেখাশুনো করবে, কিছু না কষ্ট হয়।

গণেশ তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করল। ডঃ মুখার্জী ও অশেষকে খুব কাছেই একটি ঘরে পৌঁছে দিল। ওখানে সামান্য কিছু আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা আগে থাকতেই ছিল।

গণেশ সেদিকে ইঙ্গিত করে বললো,—অনুগ্রহ করুন। হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য কিছু খেয়ে নিন। সব রেডি।

বলেই চটপট ঘরের বাইরে গেল। দুম করে দরজাটা বন্ধ করে নাটকীয়ভাবে বিদায় নিল।

ডঃ মুখার্জী ও অশেষ তখন বিস্ময়ে দুশ্চিন্তায় দিশেহারা। এ-ঘরটি আগের ঘরটির তুলনায় আরও ভয়াবহ। এখানে আসবার সময় সিঁড়ি বেয়ে বেশ খানিকটা নীচে নামতে হয়েছে। জানালা বা ঘুলঘুলি তো দূরের কথা, সামান্য কোন ফুটোফাটা পর্যন্ত এই

বন্দীশালায় চোখে পড়ছে না। এখানে দম-বন্ধ-করা অস্বস্তিকর গুমোট পরিবেশ। ঘরের এক কোণে মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে। অবিরাম ধোঁয়া বেরোচ্ছে তা থেকে। ফলে, আবহাওয়াটা গা-ছমছমে ও দুঃসহ হয়ে উঠছে আরও।

অশেষ এই অবস্থার সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। ডঃ মুখার্জীকে বলে,—স্যার, মনে হচ্ছে, আস্ত এক শয়তানের পাল্লায় পড়েছি। কী ওর মতলব, বোঝা ভার।

ডঃ মুখার্জী বললেন,—দেখা-ই যাক না, কী হয়। অযথা ব্যস্ত হয়ে তো কোনো লাভ নেই। তবে হ্যাঁ, আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।....প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি মুহূর্তে।

—সতর্ক থেকেই বা কী করতে পারি স্যার ?

—হয়তো কিছুই পারি না, অক্ষম চেষ্টা ছাড়া।

—তবে ?

ডঃ মুখার্জী কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাধা।

বহুদূর থেকে শ্যামল হাজরার চীৎকার ভেসে এলো।

—স্যার, শুনছেন ?

অশেষ বিস্ময়বিহ্বল। ডঃ মুখার্জীর দিকে প্রশ্নটা একরকম ছুঁড়ে দেয়।

ডঃ মুখার্জী বিস্ময়ের ঘোর অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন এতক্ষণে। ধীর সংযত কণ্ঠে বললেন,—হ্যাঁ, শুনেছি। তবে আমার কী মনে হয় জানো ? শ্যামল এখন আমাদের খুব কাছেই। না হলে এই বদ্ধ ঘরে বসে ওর চীৎকার শুনতে পেতাম না।

সে রাতটা চীৎকার আর কান্না শুনেই ওদের কাটল।

একদিকে শ্যামল হাজরার চীৎকার, আর অন্যদিকে অমল চক্রবর্তীর কান্না।

দুজনের কেউই ঘুমোতে পারলেন না।

পরদিন। প্রফেসার সরখেল বন্দীদের খবর নিতে এলেন।

এসেই ডঃ মুখার্জীকে তাঁর বিনীত অনুরোধ,—আপনারা চিঠি লিখুন আত্মীয়-স্বজনের কাছে। লিখে জানিয়ে দিন, ভালো আছেন। ভয় নেই, চিঠি মার যাবে না ; আমরাই পৌঁছে দেবো।

ডঃ মুখার্জী কোনোরকম দ্বিরুক্তি না করে চিঠি লিখে দিলেন। অশেষও তাঁকে অনুসরণ করল। লিখবার সময় আলোর অভাব হয় নি (যদিও দিনের বেলায়ও সে ঘর প্রায় অন্ধকার), গণেশ দুটো হ্যারিকেন এনে দিয়েছিল।

চিঠি নিয়ে প্রফেসার সরখেল ও গণেশ চলে যেতেই ডঃ মুখার্জী বললেন,—পেয়েছি! নতুন আর একটা সূত্র। আশ্চর্য! শিবেন বাগচী এ-ব্যাপারে কিছুই বলেন নি। . .

অশেষ ডঃ মুখার্জীর বক্তব্য ঠিক বুঝল না। জানতে চাইল,—কী সূত্র? কী বলেন নি?

ডঃ মুখার্জী জবাব দিলেন,—জানতে পারবে, সময় হলেই তবে এখন বেশি কিছু বলবো না ; কারণ সবটাই আমার আশঙ্কা। ভবিষ্যতে তা মিথ্যেও প্রমাণ হতে পারে।

অশেষ হতাশভাবে বললো,—কী জানি! সত্যিমিথ্যে কিছুই বুঝছি না। সবই কেমন যেন হেঁয়ালি ঠেকছে।

—হ্যাঁ, হেঁয়ালিই বটে!—ডঃ মুখার্জী ভাবলেন ; কেননা রহস্যের জট যে এত তাড়াতাড়ি খুলবে, তখনও অবধি তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

দিন কয়েক মাত্র পরের ঘটনা। ডঃ মুখার্জী ও অশেষ তখন বন্দীশালায়। হঠাৎ ওঁদের মনে হল, কা'রা যেন চারিদিক থেকে এসে ওই রহস্যপুরীকে ঘিরে ফেলছে। চীৎকার চারিদিকে, হুইস্‌ল-এর শব্দ।

খানিক বাদেই পুলিশের পোশাক পরা কয়েকজন লোক বন্দীশালায় নেমে এলো। ডঃ মুখার্জী ও অশেষকে ওরা অনুরোধ করল তাড়াতাড়ি উঠে আসতে।

—কিন্তু কেন? কী হয়েছে?—অশেষ প্রশ্ন করেছিল একবার।

পুলিশের লোক সে প্রশ্নের জবাব দেয় নি। শুধু বলেছিল,—আগে তো উঠে আসুন। তারপর একে একে সবই জানতে পারবেন।

এই অনুরোধের পর অশেষ ও ডঃ মুখার্জী কালবিলম্ব করেন নি। সরাসরি ওপরে উঠেছিলেন।

কিন্তু উঠবার পর ওরা দুজনেই হতবাক। দেখলেন,—প্রফেসার সরখেল ও গণেশ পুলিশের হাতে বন্দী। আর এতদিন যিনি বন্দী ছিলেন সেই শিবেন বাগচী পুলিশকে ব্যস্তভাবে কী সব নির্দেশ দিতে ব্যস্ত।

খানিক বাদেই শ্যামল হাজরা ও অমল চক্রবর্তীরও হদিস মিলল। দেখা গেল, কয়েকজন লোক ওঁদের নিয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।

—কিন্তু ওরা কা'রা? পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত?—অশেষ জানতে চায় জনৈক পুলিশ-অফিসারের কাছ থেকে।

অফিসারটি বলেন,—ওরা একদল পর্যটক। কিছুদিন আগে আন্দামানের এই দ্বীপে এসে বিপদে পড়েন। প্রধানতঃ ওদেরই চেষ্টায় আজকের এ পুলিশ-অভিযান সফল হল।

—হ্যাঁ স্যার, সফল, আলবাৎ সফল!—বলতে বলতে আর একজন পুলিশ অফিসার চারজন নতুন বন্দীকে নিয়ে হাজির।

—এরা কা'রা?—ডঃ মুখার্জী জানতে চান।

—এরা স্মাগ্‌লার, চোরাই-চালানদার।—আগন্তুক অফিসারটি জবাব দেন,—প্রফেসার সরখেল-এর পাপচক্রের সঙ্গে এরা যুক্ত। এদের নেতা বলরামকে অবশ্য ধরা যায় নি। সে বেপাত্তা।

ডঃ মুখার্জী ও অশেষ উভয়েরই মনে পড়ল, দ্বীপে অবতরণের দিন ঠিক এই ধরনের কয়েকজন লোককে ওরা দেখেছিলেন বটে—স্ট্যাচুর মতো ওদের মুরুব্বির সামনে বসে আছে। বলরাম-এর কথাও ওঁরা শুনেছেন শিবেন বাগচীর কাছ থেকে। এছাড়া পর্যটক

দলের ব্যাপারটাও ওদের অজানা নয়। অনেক আগেই ওরা শুনেছেন, পাঁচজনের এক পর্যটক দল এই দ্বীপে আসেন। নেহাৎই কৌতূহলের বশে আসেন ওরা। কিন্তু আশ্চর্য! একজনও ফেরেন না।

এই পর্যটক দলই কি তাহলে প্রফেসার সরখেল ও গণেশকে ধরিয়ে দিলেন? সরখেল ওদের আটকে রাখতে পারেন নি?

পুলিশ-লঞ্চে করে গোটা দলটির পোর্ট ব্লেয়ার-এর দিকে যাবার সময় এইসব প্রশ্ন উঠেছিল।

ডঃ মুখার্জী ও অশেষ জানতে পেরেছিলেন,—হ্যাঁ, এ-কীর্তি মূলতঃ ওদেরই। অনেক কষ্টে সরখেল-এর হাত থেকে ওরা মুক্তি পান, পালিয়ে বাঁচেন। তারপর নিজেদের নামধাম গোপন করে পুলিশের সাহায্য নেন, এই দ্বীপটিকে ঘিরে স্মাগ্‌লিং-এর দুষ্টচক্র আবিষ্কার করেন। স্মাগ্‌লিং-এর নেতা বলরাম প্রফেসার সরখেল-এর প্রধান অনুচর। ডুবো-জাহাজ আছে তার। তার কাজ শিকার-সংগ্রহ করা এবং ছলে-বলে-কৌশলে সেইসব শিকারকে সরখেল-এর খপ্পরে পড়তে বাধ্য করা। এজন্যে মোটা ইনাম পেত সে। ইনামের টাকা অবশ্য শিকাররাই জোটাত। শিকারের বাড়ির লোকেরা। অবশ্য পোর্ট ব্লেয়ার থেকে নিখোঁজ তরুণরা এ-পর্যায়ে পড়ে না। ওদের নিয়ে বলরাম-এর আলাদা ব্যবস্থা; স্মাগ্‌লিং-এর দুষ্টচক্রে রিক্রুট হত কেউ কেউ। কেউ বা বলরাম-এর সঙ্গে মূল ভারত-ভূখণ্ডে যেতে বাধ্য হত। ওদের নিয়ে সরখেল-এর মাথাব্যথা নেই। উনি চিঠি লেখাতেন শিক্ষিত শিকারদের দিয়ে। বলরাম ওই হতভাগ্যদের প্রাণের ভয় দেখিয়ে ওদের বাড়িতে নানারকম চিঠি-চালাচালি করতো। সর্বত্রই উল্লেখ করিয়ে দিতে সে ভুলতো না, মোটা অঙ্কের টাকা দিলে বাড়ির লোকের কুশল-সংবাদ মিলবে। সবাই টাকা দিত, কুশল-সংবাদও পেত। কিন্তু কে কোথায় আছে, চিঠি পড়ে তা ঘুণাক্ষরেও জানবার উপায় ছিল না।

—তবু সংশয় থেকে যায়। অশেষ বললো,—বেছে বেছে বিজ্ঞানীদেরই বা বন্দী করা হত কেন ?

ডঃ মুখার্জী জবাব দিলেন,—তাই বা কোথায় হয়েছে ? পর্যটক দলের একজনও তো বিজ্ঞানী নন। এছাড়া, পোর্ট ব্লেয়ার থেকে যে কয়েকজন তরুণ নিখোঁজ হয়েছে তাদের একজনের সঙ্গেও বিজ্ঞানের বিশেষ যোগ নেই।

—অন্যরা আবার সবাই বিজ্ঞানী,—শিবেন বাগচী বললেন,—আসলে কী জানেন, আমার এখনও দৃঢ় ধারণা, বিজ্ঞানীদের সত্যিকারের সাহায্যই প্রফেসার সরখেল চেয়েছিলেন। তা না হলে তিনি এই নির্জন দ্বীপে আসবেন কেন ? কেনই বা এত কষ্ট সহ্য করে, এত ঝুঁকি নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবেন ? তাঁর তো টাকার অভাব ছিল না।

ডঃ মুখার্জী বললেন, দেখুন, এ-সংসারে যাদের বেশি টাকা আছে টাকার অভাবটা উঠতে-বসতে তারাই বেশি বোধ করে। আর তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আপনি কা'কে বলছেন ? একটা উল্কাখণ্ডের ভেতর দিয়ে তামাম জগৎ-রহস্য ভেদ করা কখনও সম্ভব ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সম্ভব, নিশ্চয় সম্ভব।—হঠাৎ অমল চক্রবর্তী আর্তনাদ করে উঠলেন,—আমি যে নিজের চোখে সে-জগৎ দেখেছি ! কী করে তাকে অস্বীকার করি ?

ডঃ মুখার্জী বললেন,—আপনি ভুল দেখেছেন, মিথ্যে দেখেছেন।

—না না, মিথ্যে নয়, ভুল নয়,—অমলবাবুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ,—যা দেখেছি, তার সব সত্যি ! দিবালোকের মতো সত্যি।

বেশ তো, পরখ করে দেখা যাক,—ডঃ মুখার্জী প্রস্তাব দেন,—প্রফেসার সরখেল আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। জিনিসটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে আমরা নিজেরাই কেউ দেখি।

—কিন্তু সে পথ যে রুদ্ধ,—প্রফেসার সরখেল কাছেই ছিলেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জবাব দেন,—জিনিসটা আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, নষ্ট করে দিয়েছি।

—কেন করলেন নষ্ট? কেন করলেন?—অমল চক্রবর্তীর আর্তনাদ শোনা যায় এবার,—আমার স্বর্গলোকের চাবিটা কেন হারিয়ে দিলেন আপনি?

ডঃ মুখার্জী অমলবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করেন,—চাবি থাকলেই বা কী এমন হত? আপনি নিজে তো চোখ হারিয়ে বসে আছেন!

শিবেন বাগচী সায় দেন,—তা ঠিক, সবাই আমরা চোখ হারাবার দলে।

—কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন?—ডঃ মুখার্জী বলতে লাগলেন—আমার মনে হয়, প্রফেসার সরখেল ইচ্ছে করেই আপনাদের চোখ নষ্ট করেছেন, যাতে না আপনারা পালাবার পথ খুঁজে পান।

প্রফেসার সরখেল চীৎকার করে ওঠেন এইখানে,—ভুল কথা। অন্যায় কথা। মিথ্যে কথা। সে-রকম কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

—কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য যে মহৎ, তারই বা প্রমাণ পাচ্ছি কই? ডঃ মুখার্জী তাঁকে থামিয়ে দেন,—সাকরেদ গণেশকে নিয়ে আপনি নিজেই তো এমনকি আমাদেরও বন্দী করেছেন!

—সবকিছুর পেছনেই একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।—প্রফেসার সরখেলের কণ্ঠস্বর বজ্রগম্ভীর এবার।

—হুঁ, উদ্দেশ্য যে মহৎ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি,—ডঃ মুখার্জী শ্যামল হাজরাকে দেখিয়ে বলেন, এই তো আপনার মহৎ উদ্দেশ্যের আর এক শিকার।

—তা বটে! তা বটে! এক হিসাবে আমরা শিকারই বটে।—

অমল চক্রবর্তী আপন মনেই বিড়বিড় করেন,—কিন্তু তবু, যে জিনিস আমরা দেখেছি, কেউ কি কোনদিন তার সন্ধান পাবে ?

শিবেন বাগচী সায় দেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি ; অদ্ভুত আশ্চর্য সব জগৎ ! কিছুতেই ভুলতে পারি না !

অশেষ খানিকটা দূরে অস্পষ্টভাবে চোখে-পড়া পোর্ট ব্লেয়ারকে দেখিয়ে বলে,—এই যে, এদিকে তাকান ; পৃথিবীর মানুষের দুঃখ-সুখের নীড়ের দিকে। এ-জগৎকে দেখে সব ভুলতে পারবেন।

# নতুন পৃথিবীর সন্ধানে

॥ এক ॥

সেদিন রাত্রে, অধ্যাপক আমায় ডেকে পাঠালেন। খুব নাকি তাড়া। তখুনি যেতে হবে।

গেলাম। বলতে গেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম ল্যাবরেটরীর দিকে।

ওখানেই থাকেন তিনি। দিনরাত গবেষণায় নিমগ্ন। আমি ল্যাবরেটরীতে ঢুকছি, তা যেন তিনি টেরই পেলেন না। আপন মনেই বিড়বিড় করে চললেন,—মূর্খ! সব মূর্খ! গোটা জগৎ। বিজ্ঞানের কী বোঝে ওরা? তুচ্ছ গোটা দুই আবিষ্কার বৈ তো নয়। ওই দেখেই সব একেবারে গদগদ। বলে কিনা, আমি নাকি এ-জগতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। দূর দূর! আমার কতটুকু জেনেছে ওরা? আসল আবিষ্কারের কতটুকু?

বললাম,—অনেক কিছুই স্যার। এই তো সেদিন। মারাত্মক এক রাসায়নিক আবিষ্কার করলেন, সব রকম রোগ-জীবাণু যা দিয়ে নাকি ধ্বংস করা যায়।

অধ্যাপক বললেন,—মূর্খ! তুমিও একটি মূর্খ! ওকে আবার বড় আবিষ্কার বলে?

বললাম,—বেশ, জার্ম-কিলার-এর কথা না-হয় ছেড়ে দিলাম; কিন্তু প্রটো-টক্‌সিন? যার সাহায্যে প্রটোপ্লাজম্ নবজীবন লাভ করবে, জীবের আয়ু দ্বিগুণ হবে, আবিষ্কার হিসেবে নিশ্চয়ই তা ছোট নয়?

অধ্যাপক এবার অদ্ভুতভাবে তাকালেন। যেন আমার ভুল সংশোধন করে দিয়ে বললেন,—ছোট। আসলে খুবই ছোট ওরা। গবেষণার কালে উপরি-পাওয়া। আমার মূল আবিষ্কারের কিছুই বিশ্বজগৎ এখনও জানে না।

অবাক হয়ে বললাম,—সে কী! আমিও না?

অধ্যাপক বললেন,—না। যদিও গত দশ বছর ধরে তুমি আমার সহকারী, তবু সব আমি গোপন রেখেছি।

শুধালাম,—কেন? সহকারীকে বিশ্বাস করতে পারেন নি?

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়,—অধ্যাপক আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে শুরু করলেন,—কথা হল সাফল্যের। পর্বতের চূড়ায় উঠবার আগেই কোন্ সাহসে বলবো, 'উঠেছি'? নক্ষত্র ডিঙোলাম না; কেন বলবো, 'ডিঙিয়েছি'?

বললাম,—আমাকে বলতে পারতেন।

—বলবো, সব বলবো! অধ্যাপক উত্তেজনায় কাঁপছেন এবার. —সে-জন্যেই তো ডেকেছি। গত তিরিশ বছর ধরে কাউকে যা বলিনি, তোমার কাছে আজ তা খুলে বলবো। কারণ, আজ আমি সফল। তিরিশ বছরের গবেষণা সার্থক আজ।

—কোন্ গবেষণার কথা বলছেন? এ-সব কী বলছেন আপনি? —অধ্যাপকের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। কিছুই বুঝতে না পেরে একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অধ্যাপক আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। ঘরময় পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। তারপর ক্লান্ত হয়ে বসলেন। ভাবতে ভাবতে নীহারিকার ওপারে কোন্ এক অজানা জগতে হারিয়ে গেলেন যেন।

আমি অস্থির হয়ে উঠছিলাম। কিছুতেই আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না। অধ্যাপককে তাই ধরে বসলাম,—কই! বলুন? কী যেন বলবেন, বলেছিলেন?

অধ্যাপক এবারেও নিরুত্তর। আমার প্রশ্ন শুনছেন, মনে হল না। কারণ, খানিক বাদেই আপন মনে বিড়বিড় করছিলেন তিনি,—ব্রহ্মাণ্ড? সৌরজগৎ? কী যে বলো তোমরা? জ্ঞানের বড়াই করো? আসল ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ যদি জানতে তো এই

দুনিয়াটা খেলো ঠেকতো তোমাদের কাছে। একেবারেই কৃত্রিম আর তুচ্ছ মনে হ'ত।

শুধালাম,—অধ্যাপক, আপনি কি অসুস্থ? একটানা গবেষণায় ক্লান্ত?

—মোটেও না!—এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন বেচারী। আমার দিকে উজ্জ্বল দু'টি চোখ তুলে বললেন,—বরং ঠিক এই মুহূর্তেই সবরকম ক্লান্তি আর অবসাদের উর্ধ্বে আমি। সাফল্য এখন আমার হাতের মুঠোয়।

বললাম,—হেঁয়ালির মতো ঠেকছে। কিছুই বুঝছি না।

—বুঝবে,—বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠলেন তিনি। ল্যাবরেটরীর এক বন্ধ দরজার দিকে এগোলেন।

আমি জানতাম, ঐ দরজাটি খুললেই ছোট্ট এক কুঠরি, নানারকম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। অধ্যাপকের ওটা খাস-তালুক। ওখানে এমনকি আমারও প্রবেশ-নিষেধ।

কিন্তু সেদিন কী যে হল! দরজা খুলেই অধ্যাপক ডাকলেন,—কই! এসো।

এগোলাম, কয়েক পা। কিন্তু পুরনো অভ্যাসবশে পরক্ষণেই আবার থমকে দাঁড়ালাম। অধ্যাপক ততক্ষণে কুঠরির ভেতরে। যন্ত্রপাতি নাড়ছেন। খুঁজে খুঁজে বের করছেন কী সব যেন।

খানিক বাদেই বেরিয়ে এলেন। হাতে একটি টেস্ট্-টিউব; বিবর্ণ কিছু তরল পদার্থে তার অর্ধেকটা ভরা।

শুধালাম,—কী ওগুলো?

অধ্যাপক আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করলেন,—কী?

কিছুই বুঝতে না পেরে অধ্যাপকের দিকে তাকালাম। তরল পদার্থটা ঝলমল করছিল তখন। আশ্চর্য এক নীলচে আভা তা থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছিল।

অধ্যাপকই শুরু করলেন আবার,—দেখছো? আমার হাতে? তিরিশ বছরের গবেষণার সাফল্য?

বললাম,—সাফল্য ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বিরাট। দুনিয়ায় যা নাকি কেউ কোনোদিন ভাবেনি, —বলতে বলতে অদ্ভুত এক দীপ্তি ফুটে উঠল অধ্যাপকের চোখেমুখে। আর আমার মনে হল, বিজ্ঞানীর চোখ নামক দু' দুটো বিরাট নক্ষত্র ঠিক আমার মুখোমুখি। বেশিক্ষণ তাকান গেল না সেদিকে। বাধ্য হয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। অধ্যাপক ততক্ষণে আবার শুরু করেছেন,—ধৈর্য ধরো বন্ধু। আর একটু অপেক্ষা করো। সাফল্যের চেহারা তুমি নিজেই পরখ করবে।

আমি!—অধ্যাপকের কথায় ঠিক সেই মুহূর্তে একটু চমকে উঠেছিলাম হয়তো। কিন্তু আসল ব্যাপারটার কিছুই তখনও বুঝিনি। আমাকে সত্যিসত্যিই যে পরখ করতে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি তা।

ওদিকে অধ্যাপক খুব অস্থির। স্বচ্ছ এক পাত্রের মধ্যে টেস্ট্-টিউবটিকে রেখেছেন। ঘরময় পায়চারি শুরু করেছেন আবার।

আমি ভাবছি, নিশ্চয়ই আবিষ্কারটা বিরাট কিছু। নিশ্চয় যুগান্তকারী; এমন সময় অধ্যাপক ডাকলেন আমায়। রাত্রির আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন,—ছাখ, দূরের ঐ নক্ষত্র-জগৎ। ঐ অজ্ঞাতলোক! আচ্ছা, ওরা কি তোমায় অবাক করে না? ওদের তুলনায় তুমি কত ছোট, তা ভাবতে সাহায্য করে না?

বললাম,—করে। কিন্তু ভাবনার শেষ কোথায়?

অধ্যাপক উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন,—তোমার জগতের মূর্খ বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো। ওরা তো সবেরই শেষ জেনে বসে আছে। বলছে, অচিরেই ঐ সব নক্ষত্রলোকেও নাকি পাড়ি দেবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানবে। শুধুমাত্র জ্বালানি বা শক্তি-আবিষ্কারের অপেক্ষা....আরে দূর দূর! নির্বোধের দল। তোদের এই সমস্যার সমাধান এক মাসেই আমি করতে পারি। কিন্তু না, করবো না। কিছুতেই না। খুঁজে মর তোরা। অন্ধের মতো পথ হাতড়ে বেড়া। নিবুদ্ধিতার খেসারত দিতে গিয়ে তোদের জীবনগুলো বরবাদ হোক।

শুধালাম,—ওদের সর্বনাশে আপনার লাভ ?

অধ্যাপক জবাব দিলেন,—লাভ কিছুই না ; বরং ক্ষতি ।

বললাম,—তবে ? তবে কেন ওদের বুঝিয়ে বলেন না ?

অধ্যাপক রাগে কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিলেন—বললেই শুনছে কে ? মহাকাশ-ভ্রমণের স্বর্গসুখ কে এখন হাতছাড়া করছে ?

—আসলে কী জানো ?—একটু থেমে অধ্যাপক শুরু করলেন আবার,—ওরা যদি দূরের নক্ষত্রলোকে কোনোদিন যায়ও তো মূল সমস্যার সমাধান কিছুই হবে না ।

অবাক লাগল । নির্বোধের মতো প্রশ্ন করলাম সেদিন,—কিছুই হবে না ? মানে ?

—ধরো, সর্বোচ্চ গতি তুমি পেয়েছ । ঠিক আলোর মতোই সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ছুটলে । সারা জীবন ধরে ছুটেও কী দেখবে তুমি ?....দেখবে যে, নতুন নতুন নক্ষত্র-জগৎ আবিষ্কার করেছ বটে ; কিন্তু আরও কোটি কোটি, কোটি কোটি জগৎ তোমার অজানা । ....না, কোনোদিনই তুমি ওদের জানবে না । কারণ, এমন নক্ষত্র অনেক আছে যাদের আলো এখন অবধি আমাদের জগতে এসে পৌঁছয়নি । এখন বোঝ, এ-জগতের কোটি কোটি বছরের অভিজ্ঞতায় যা সম্ভব হল না, তুমি এক জীবনে তা কী করে সম্ভব করবে ?

বলতে যাচ্ছিলাম, গতিবেগই সব নয় । অনুভূতিরও মূল্য আছে । কিন্তু তার আগেই অধ্যাপক থামিয়ে দিলেন আমায় । বলতে লাগলেন,—ছাখ, দূরের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে আমিও এক এক সময় আকাশ-পাতাল ভাবতাম । দূরবীনের সামনে বসে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটাতাম । কিন্তু লাভ কী হল ? গাদা গাদা অঙ্ক আর ঐ প্রকাণ্ড দূরবীন দিয়ে সমস্যার সমাধান হল কি ? হল না । তাই নতুন পথ খুঁজতে হল । হ্যাঁ, পথ আমি এতদিনে পেয়েছি । এক আশ্চর্য পথ । এর পথিক হতে গেলে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সামান্য একটু বদলাতে হবে তোমার ।

বললাম,—ঠিক বোঝা গেল না। দয়া করে খোলসা করুন।

অধ্যাপক আসল ব্যাপারটা খোলসা করতে গিয়ে আরও যেন জট পাকালেন।

—আজ বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ধারণাই বদলে গেছে আমার,—অধ্যাপক এখন ধীর ও শান্ত,—আমি জেনেছি, আমাদের গ্রহটি এবং তার প্রতিবেশী গ্রহগুলো হল পরমাণুর ভেতরকার ইলেকট্রন। সূর্য ওদের নিউক্লিয়াস। ওকে ঘিরেই ইলেকট্রন-রূপ গ্রহদের আবর্তন।

শুধালাম,—কী বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি,—অধ্যাপকের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা,—পরমাণুর ভেতর ফাঁক নেই?····আছে। প্রচুর। ইলেকট্রনরা সেখানে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক আমাদের এই জগতের ঢঙেই চলছে ওরা। এ-জগৎ এবং অন্যান্য গ্রহরা যেমন আমাদের নক্ষত্র বা সূর্যকে, ওরা তেমনি ওদের নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করছে।

বললাম,—বেশ, তর্কের খাতিরে না-হয় মেনেই নিলাম যে আমাদের সৌরজগৎ একটি পরমাণু। কিন্তু কী হল ওতে?

অধ্যাপক জবাব দিলেন,—অনেক কিছু। আমাদের সৌরজগৎ যদি পরমাণু হয় তবে আরও যে-সব কোটি কোটি, কোটি কোটি সৌরজগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে, ওরাও ঠিক তাই।

—অর্থাৎ পরমাণু?

—হ্যাঁ। সূর্য গ্রহ এবং উপগ্রহদের নিয়ে যেমন সৌরজগৎ, নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন এবং প্রোটনদের নিয়ে তেমনি পরমাণুজগৎ। আসলে এ দু-প্রকার জগৎই এক। আমরা বুঝতে ভুল করি বলে দুই ভাবি।

এইখানে বাধা দিলাম, কিন্তু—

অধ্যাপক আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন,—না না, এতে আর কিন্তু নেই। যা ধ্রুব সত্য, কিছুতেই তা অস্বীকার করার জো নেই। আসলে আমাদের সৌরজগৎ একটি পরমাণু এবং এইরকম আরও কোটি কোটি পরমাণুকে নিয়ে বিশ্বজগৎ।

শুধালাম,—কিন্তু অণু? কী করে তার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করবেন?

অধ্যাপক জবাব দিলেন,—কী করে আবার? অতি সহজে। পরমাণু নিয়ে যেমন অণু, সৌরজগৎকে নিয়ে তেমনি নক্ষত্রমণ্ডল বা গ্যাল্যাক্সি। অনেক অণু সেখানে; পরমাণুও অজস্র। বুঝলে?

বললাম,—না, ঠিক স্পষ্ট নয় এখনও।

—গ্যাল্যাক্সির দিকে তাকালে কী চোখে পড়ে?—অধ্যাপক ব্যাখ্যা শুরু করলেন আবার,—কোটি কোটি নক্ষত্র। কেমন? তাই না? ওরা হল পরমাণু। আবার কত অগুনতি গ্যালাক্সি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। সব ছুটছে। দুরন্ত বেগে। (কী বিরাট শূন্যতা ওদের এক একটির মাঝখানে!) ওরা কী? না অণু। কতদূর অবধি আছে ওরা?—জবাব নেই। আমার দূরবীন ওখানে থৈ পায় না।

বললাম,—আমিও কিন্তু অথৈ শূন্যে। নিশানা হারিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি।

অধ্যাপক আমার কথায় ভ্রূক্ষেপই করলেন না। আপন মনে বলতে লাগলেন,—এই সব নক্ষত্রমণ্ডল বা গ্যাল্যাক্সিকে একসঙ্গে মিলিয়ে ধরলে কী দাঁড়ায়?....দাঁড়ায় একটা বস্তু যা নাকি কোটি কোটি অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া।

অবাক হয়ে বললাম,—বস্তু?

অধ্যাপক জবাব দিলেন,—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সে বস্তুটা আমাদের অজানা কোনো জগতের এক ফোঁটা জল হতে পারে। এবং এমনকি এক কণা বালিও হতে পারে।

—বলেন কী!—আমি স্তম্ভিত,—এ-ও কী সম্ভব?

অধ্যাপক জানালেন,—নিশ্চয়ই। আসলে এই হল জগতের স্বরূপ। জগৎ জুড়ে শুধু এই অণু-পরমাণুর খেলা।

বললাম,—অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য!

—অবিশ্বাস্য?—অধ্যাপক উত্তেজিত এবার,—আরও এক ধাপ এগিয়ে চিন্তা করো। যদি বলি, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারিদিকে

ঘুরপাক খাচ্ছে যে ইলেকট্রন সেখানেও জগৎ থাকতে পারে ? তুমি তুলনায় অনেক বড় বলে তা দেখতে পাচ্ছ না ? যদি বলি অসংখ্য পরমাণু নিয়ে যে অণু, সেখানেও এমন অগুনতি জগৎ আছে ? লক্ষ লক্ষ অণু নিয়ে আবার—

আমি আর থাকতে পারলাম না। চীৎকার করে উঠলাম,—দোহাই আপনার! চুপ করুন! এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। সত্যি যদি এইরকম হয় তো শেষ কোথায় ? পরিণতি কী ? অনাদি-অনন্তকাল ধরে ভেবেও যে এর কিনারা পাবো না! এবং এছাড়া, আপনার আবিষ্কারের সঙ্গেই বা এর যোগ কী ? একটু আগে যে তরল পদার্থটা দেখালেন, তা দিয়ে কা'র কী উপকার হবে ?

—উপকার ?—অধ্যাপকের চোখ জুড়ে আবার যুগল-নক্ষত্রের দীপ্তি,—শোন তবে। যখন আমি বুঝলাম, বিরাট-বিপুল নক্ষত্রমণ্ডল বা নীহারিকার দিকে তাকিয়ে লাভ হবে না, তখনই তাকালাম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর দিকে। আমার বদ্ধমূল ধারণা হল, নক্ষত্র বা সূর্যকে ঘিরে যদি জগৎ থাকতে পারে তো পরমাণুকে ঘিরেই বা থাকবে না কেন ?

এতক্ষণে অধ্যাপকের যুক্তিজালটা লক্ষ্য করলাম। কিন্তু তবু সব কিছু বোঝা গেল না ঠিক। বরং তাঁর পরবর্তী কথাগুলো আরও যেন অদ্ভুত শোনাল।

তিনি বলতে লাগলেন,—ভেবে দেখলাম, নক্ষত্ররা অনেক দূরে। ওদের রহস্য কোনোদিনই ভেদ করতে পারবো না। কিন্তু তাতে কী! কাছেই তো পরমাণুরা। ওদের নিয়ে গবেষণা করি না কেন! সর্বত্রই আছে ওরা। জলে, স্থলে, আকাশে—সর্বত্র। তবে হ্যাঁ, ওরা খুবই ছোট। ওদের রহস্য ভেদ করতে গেলে আমাকেও ছোট হতে হবে। ঠিক ওদের মতোই ছোট ; অথবা তার চেয়েও বেশি। কী জানো, আমি এই ছোট হবার পথ খুঁজে পেয়েছি। টেস্ট-টিউব-এ যে তরল পদার্থ তুমি দেখলে তা দিয়েই ওটা করা সম্ভব। এই পদার্থটি আমার দেহের প্রতিটি পরমাণুকে সংকুচিত

করবে। প্রতিটি ইলেকট্রন এবং প্রোটন-এর আকার ক্রমেই ছোট এবং আরও ছোট করবে। অর্থাৎ কিনা, আমার দেহের সংকোচনের সঙ্গে সরাসরি তাল রেখে চলবে ওরা। অর্থাৎ, আমি শুধু পরমাণুর মতো ছোট হতে পারবো না, তার চেয়েও ছোট—আরও অনেক অনেক গুণ ছোট হতে পারবো।

॥ দুই ॥

এ-ও কখনও সম্ভব? পরমাণুর চেয়ে কেউ ছোট হতে পারে?

অধ্যাপকের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। সন্দেহ হল, অতিরিক্ত গবেষণায় ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়েছে। বদ্ধ উন্মাদ হয়েছেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত মুখ ফসকে বেরিয়েও গেল,—অধ্যাপক, উন্মাদের মতো কী যা তা বলছেন?

—যা তা বলছি?—জবাব এল অপর দিক থেকে। মুমূর্ষু কোনো নক্ষত্র নিভে যাবার আগে হঠাৎ যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, ঠিক তেমনি এক আশ্চর্য দীপ্তি অধ্যাপকের চোখেমুখে ফুটে উঠল!

—আমি উন্মাদ? রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি শুরু করলেন,—তা বটে। তোমার মতো মূর্খদের কাছে আমি উন্মাদই বটে। আমাকে বুঝতে ভুল করবে, এ তো জানা কথা!

বললাম,—না না, ভুল আমার নয়; আপনার।

—তাই বুঝি!—অধ্যাপক রহস্যময় এবার। বহুদূরের কোনো ছায়াপথের মতো অস্পষ্ট।—আসলে কী জানো!—একটু থেমে আবার শুরু করলেন তিনি,—বিষয়টা তোমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে, তার কারণ, এ-ধরনের ভাবনার সঙ্গে কেউ পরিচিত নও। সবাই তোমরা আদ্যিকালের কিছু উল্কাপিণ্ডের মতো একই জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছ।

বললাম,—তা কেন! ধূমকেতুও হচ্ছি। মহাকাশের পথে রকেট পাঠাচ্ছি হামেশাই।

অধ্যাপক বললেন,—এইখানেই ভুল তোমাদের। এই জ্ঞানের বড়াই! যদি জানতে, কত কম জানো তোমরা! বিরাট এই ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় তোমরা যে কত ছোট!

বললাম,—ছোটবড় নিয়ে সারাক্ষণ এত মাথা ঘামিয়ে লাভ?

—লাভ?—অধ্যাপক রহস্যময় আবার; কোটি কোটি আলোক-বর্ষের ওপারে অজানা কোনো নীহারিকালোকের মতো সুদূর।

বললেন,—আসল লাভ যে কী, তা খানিক বাদেই জানবে। টেস্ট্-টিউবে রাখা ওই তরল পদার্থটা তোমার দেহে ঢুকিয়ে দিলেই।

বললাম,—আবার প্রলাপ বকছেন?

—না না, প্রলাপ নয়।—অধ্যাপকের কথায় হাজার সূর্যের উত্তাপ, ওই 'স্রিন্‌ক্‌স্'ই হল আসল জিনিস। ওদিকে ছাখ, ওই টেস্ট্-টিউবটির দিকে।

দেখলাম। খানিক আগেও দেখেছি ওটা। অধ্যাপকের বকুনিও শুনেছি, ওই দিয়েই নাকি পরমাণুর চেয়ে ছোট হওয়া যাবে। কিন্তু হায়! তখনও কি ছাই জানতাম, আমিই হবো ওর প্রথম শিকার!

ওদিকে অধ্যাপক থামেন নি তখনও, বলে চলেছেন,—'স্রিন্‌ক্‌স্' প্রথম গ্রহণ করবে তুমি। পরমাণুর জগতে তুমিই প্রথম যাবে।

প্রবল প্রতিবাদ করলাম,—কী আবোল-তাবোল বকছেন? আপনার সহকারী হতে পারি, কিন্তু পাগলামীর সাকরেদ নই। ঝোঁক বেশি চাপে তো দয়া করে নিজেকে বা আর কাউকে অনুগ্রহ করুন; আমাকে নয়।

অধ্যাপক জবাব দিলেন,—হ্যাঁ, একরকম অনুগ্রহই বলতে পারো; তোমাকে দেখাচ্ছি।

বললাম,—দোহাই আপনার! একটু চুপ করুন। একটানা গবেষণায় আপনি ক্লান্ত। ঘরে গিয়ে একটু ঘুমুন।

অধ্যাপক আমার কথায় কান দিলেন না। বরং তাকালেন এমনভাবে যে দেখে মনে হল, ওস্তাদ শিকারী বুঝি। আসল শিকারকে হাতের একেবারে মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন।

আবার প্রতিবাদ করলাম,—দেখুন, আমি ছুটি চাই। আপনি বিশ্রাম না করুন আপত্তি নেই, দয়া করে আমায় করতে দিন।

অধ্যাপক খুব অবাক হলেন যেন,—বিশ্রাম! কী বলছো তুমি? সত্যিকারের বিশ্রাম বলে কিছু কি আছে? বিশ্বভুবনের সবই কি চঞ্চল নয়?

বললাম,—এ আপনাদের কেতাবী তত্ত্ব; শুনতে পেল্লাই, কিন্তু আসলে ঠুনকো। এ নিয়ে জীবন চলে না।

অধ্যাপক জবাব দিলেন,—আলবাৎ চলে। চলছে এবং চলবেও।

বললাম,—না না, কখনও না।

বটে!—অধ্যাপক অতিকষ্টে হাসলেন একটু,—চলে কিনা, তুমি নিজেই তা দেখবে।

চীৎকার করে উঠলাম এবার,—বলছি তো আপনার ওই আজগুবি তত্ত্ব অন্য কোথাও পরখ করুন। আমি কারও শিকার হতে রাজী নই।

—আহা! শিকার বলছো কেন?—অধ্যাপক খুব যেন আঘাত পেলেন আমার কথায়,—এ তো মুক্তি! পরমাণুর জগতে এই হবে প্রথম অভিযান।

বললাম,—কাজ নেই এতে। এর চেয়ে বরং ঘরের দিকে অভিযান করুন। মাথা ঠাণ্ডা হবে; আর আমিও বাঁচবো।

অধ্যাপক আমার কথায় আমলই দিলেন না। বরং তাঁর আগের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন,—প্রথম অভিযাত্রী হিসেবে তোমাকে নির্বাচনের পেছনে অনেকগুলো কারণ। প্রথমতঃ, একবার অভিযান শুরু করলে আর না-ও ফিরতে পারো তুমি। আবার তুমিই হতে পারো পথিকৃৎ; আমি নিজে যে অভিযান করবো তার পথ-প্রদর্শক।

বললাম,—থাক থাক। আর কাউকে এই সুযোগ দিন। আমাকে নয়।

অধ্যাপক আমার কথা যেন শুনতেই পেলেন না।

—ভয় কী!—তিনি বললেন,—সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো। তোমার চেতনা মুহূর্তের জন্যেও সংযোগ হারাবে না আমার সঙ্গে। 'স্রিন্‌ক্‌স্'-এর বৈশিষ্ট্যই এই। দেহের রক্তের মধ্যে সরাসরি এটা ঢুকিয়ে দিতে হয়। দেখবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সংকোচন শুরু হবে তোমার এবং প্রথমে তা ধীরে ধীরে চলবে। ক্রমে বাড়বে এই সংকোচন। তোমার দেহে রক্তাচলাচল বন্ধ না হওয়া অবধি বাড়বে।

আবার শুরু করলেন তিনি,—অনবরত এ বেড়েই চলবে; আর যদি না বাড়ে তো বুঝবো, কোথাও ভুল করেছি, সংশোধন দরকার।

বললাম,—সবচেয়ে আগে দরকার আপনার বিশ্রাম। যান যান; ঘুমোন গে একটু; আর না-হয় আমায় যেতে দিন।

বলেই যাবার উদ্যোগ করছিলাম। কিন্তু তার আগেই অধ্যাপক বিদ্যুৎবেগে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। টেবিলের উপর থেকে মুহূর্তের মধ্যে কী যেন তুলে নিলেন তিনি। আর আমার মনে হল, হাতে কোনো ছুঁচ ফুটছে। অধ্যাপক জোর করে ফুটিয়ে দিচ্ছেন।

পালাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না, বৃথা চেষ্টা। হাতে ব্যথা লাগল। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। চোখের পলকে সব যেন অন্ধকার মনে হল।

অবিশ্যি এটা সাময়িক। খানিক বাদেই ঝিমুনি কেটে গেল। সব কিছু স্পষ্ট চোখে পড়ল আমার।

আমি দেখলাম, অধ্যাপক দাঁড়িয়ে। ঠিক আমার মুখোমুখি। একদৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। দেখছেন কী যেন।

ভীষণ রাগ হল। ভাবলাম, এই সুযোগ। ধাক্কা মারি ওকে; ঠেলে দিয়েই পালাই। কিন্তু হায়! ঠেলবো কী! হাত নাড়তে গিয়ে দেখি, অসাড়। পা তুলতে গিয়ে দেখি, পারছি না।

ইচ্ছে হল, খুব করে গালিগালাজ করি। প্রতিশোধের ভঙ্গ

দেখাই। পাগলা অধ্যাপককে ভালভাবে সমঝে দিয়ে বলি যে এ-ধরনের বুজরুকির ফল ভাল হবে না।

কিন্তু না, বলা আর হল না। আমি একেবারেই অসহায় তখন। পুরোপুরি বোবা। অনেক চেষ্টায়ও কিছু বলতে পারলাম না।

অধ্যাপক সেটা লক্ষ্য করে থাকবেন। হয়তো বা আমার মনের কথাও আঁচ করে থাকবেন তিনি! কেননা, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁকে বলতে শোনা গেল,—কী? অসুবিধে হচ্ছে? হাত-পা নড়ছে না? কথা বন্ধ? আমার উপর রাগ হচ্ছে খুব?

বলতে চাইলাম,—রাগ! ইচ্ছে হচ্ছে ঘুঁষি মেরে আপনাকে ঠাণ্ডা করি।

ওদিকে অধ্যাপক আমার মনের কথা পড়ে নিলেন যেন কৈফিয়ৎ দিতে লাগলেন,—কী করবো, বলো? এ-ছাড়া উপায় ছিল না। দীর্ঘ তিরিশ বছরের গবেষণা ঠিক চরম মুহূর্তের মুখোমুখি এসে নষ্ট হবে, কিছুতেই এ মেনে নিতে পারলাম না। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ তুমি! আমি ক্লান্ত। ভীষণভাবে ক্লান্ত।

বলতে চাইলাম,—আপনার যা-খুশি হোক। ও নিয়ে আমার আর মাথা-ব্যথা নেই। আপাততঃ সম্মোহনের ভাবটা কেটে গেলেই আমি খুশি।

হ্যাঁ, তখনও বদ্ধমুল ধারণা ছিল আমার, সম্মোহিত হয়েছি; কিছুক্ষণের মধ্যেই তা কেটে যাবে। ওদিকে অধ্যাপক খুব গম্ভীর তখন। ধীর, ভরাট গলায় নিজের কীর্তির ফিরিস্তি দিচ্ছেন,—তোমাকে দেবার মতো 'ড্রিন্‌ক্‌স্' আগে থাকতেই আমি প্রস্তুত রেখেছিলাম। সামনের ওই টেবিলের ওপর ওটা ছিল। আর টেস্ট্-টিউবে যা দেখলে, তা আছে আমার জন্যে।

থাকুক, না থাকুক, কিছুই যায়-আসে না ওতে। যত সব পাগলের প্রলাপ!—আমি ভাবছিলাম। অধ্যাপক তখনও আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। বলছিলেন,—ছাখ, পরমাণুকে যখন আমরা ভাঙি, কী বিরাট শক্তি উৎপন্ন হয় তখন! না জানি কোন্

অজানা জগৎকে তখন আমরা ধ্বংস করি! অবশ্য তুমি ধ্বংস করবে না। সৃষ্টি-রহস্যের গভীরে যাবে ক্রমেই। একটু বাদেই তোমার চলৎশক্তি ফিরে আসবে। কথাও বলতে পারবে তখন। কিন্তু দেখো, ততক্ষণে তোমার সংকোচন শুরু হয়েছে....হ্যাঁ, হবেই। তোমার মাংসপেশীগুলো স্বাভাবিক হওয়া মাত্রই ওটা শুরু হবে। ক্রমশ ছোট হতে থাকবে তুমি।

ইচ্ছে হল, এবার চীৎকার করি। বলি যে, না না; এসব বিশ্বাস করি না।

কিন্তু না, তখনও বোবা আমি। কিছুই বলতে পারলাম না। অধ্যাপকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম শুধু।

অধ্যাপক অন্যমনস্ক হলেন হঠাৎ। বিড় বিড় করলেন,—দেখি, সব আবার ঠিক আছে কিনা। একটু বাদেই সাড় ফিরে আসবে, ওর সংকোচন শুরু হবে। তার আগেই তৈরী থাকা দরকার।

তৈরী? অধ্যাপক বলে কী?

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখেমুখে দারুণ বিস্ময় আর বিরক্তি ফুটে উঠেছিল হয়তো। এবং হয়তো অধ্যাপক তা টেরও পেয়েছিলেন। কারণ, ঠিক তখুনি তিনি একরকম ক্ষমা চেয়ে নিলেন,—মার্জনা করো বন্ধু। বিজ্ঞানের খাতিরে তোমায় বিব্রত করলাম। ভুল বুঝবে না, আশা করি।

অধ্যাপক আমার সামনে থেকে সরে গেলেন এবার। সেই গোপন কুঠরিতে ঢুকে কী সব যেন যন্ত্রপাতি বের করলেন।

খানিক বাদেই দেখলাম, ঠিক আমার সামনে তিনি। অদ্ভুত এক টুপি মাথায়; কানে লাগানো কী সব যন্ত্রপাতি। চোখে চশমা গোছের কী যেন। আর বুকে ঝোলান অদ্ভুত একটা বাক্স।

ঠিক ঐরকম আর একটা বাক্স টেবিলের উপর ছিল। তার দিয়ে দু'টো বাক্সকে জুড়লেন তিনি। টুপি থেকে বেরিয়ে আসা তারগুলোকে নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করলেন।

আমি ওর কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত। ভাবছিলাম, কী করতে চান উনি? আদৌ কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা?

হ্যাঁ, তখনও আমি বুঝতেই পারিনি, আসলে কী ঘটছে। পরমাণুর জগতে যাচ্ছি, এ ছিল আমার কল্পনার বাইরে।

ওদিকে অধ্যাপক তখন নিশ্চিন্ত। মিটি মিটি হাসছেন; আর বুকে লাগানো বাক্সটার বোতাম টিপছেন থেকে থেকে। হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন তিনি,—হয়েছে! শ্রিনক্‌স্‌'-এ কাজ হয়েছে! সংকোচন শুরু হয়েছে এবার।

—কী? মালুম হচ্ছে?—আমার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে তিনি শুধোলেন,—বলো, অন্যরকম অনুভব করছ না? সব কিছুই বড় ঠেকছে না? আগের তুলনায় অল্প একট বড়?....এই যাঃ! ভুল হল। জবাব দেবে কী করে? দেহের সাড়ই তো ফিরে আসে নি এখনও।....তবে হ্যাঁ, আসবে। একটু বাদেই।....ততক্ষণ আমার দিকে তাকাও। ছাখ, আগের তুলনায় আমাকে বড় ঠেকছে কিনা।

—কী? ঠেকছে?—প্রায় আমার গায়ের উপর ঝুঁকে পড়ে তিনি শুধোলেন। আমি ভালো করে তাকালাম তাঁর দিকে। বুঝতে চেষ্টা করলাম। এবং এ কী! কী বুঝতে কী বুঝলাম আমি! স্পষ্ট দেখলাম, অধ্যাপককে আগের তুলনায় বড় দেখাচ্ছে!

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। মুখ পাণ্ডুর হয়ে থাকবে। কেননা ঠিক তখনই অধ্যাপককে বলতে শুনলাম,—আঃ! নিশ্চিন্ত এবার! তুমি ধরতে পেরেছ! ক্রমেই যে ছোট হচ্ছ, তা এতক্ষণে বুঝেছ।

কথা বলতে চেষ্টা করলাম আবার। ইচ্ছে হল, চেঁচিয়ে বলি, অধ্যাপক! দোহাই তোমার! ছেড়ে দাও! দয়া করে মুক্তি দাও আমায়!

অধ্যাপক তখন বোধ করি অন্য কিছু ভাবছিলেন। আমাকে নিয়ে নতুন কোনো স্বপ্ন দেখছিলেন হয়তো। বললেন,—ছাখ, খুব ভালো করে। আমাকে তো বটেই, এই ল্যাবরেটরীকেও। এর

দেয়াল, সিলিঙ্, যন্ত্রপাতি—সব কিছুই খুব মন দিয়ে ছাখ এবার।···· দেখছো ?

হ্যাঁ, দেখলাম ; এবং আশ্চর্য ! সব কিছু আগের তুলনায় বড় ঠেকল !

মনে হল, ঘরটা আগের তুলনায় উঁচু হয়ে গেছে। দেয়ালগুলো দূরে সরে গেছে খানিকটা।

অধ্যাপক বললেন,—কী ? সবই বড় ঠেকছে তো ? হুঁ, ঠেকছে। তোমার চোখ দেখেই বুঝছি। আসলে কী জানো, কিছুই বড় হয়নি ; তুমি নিজে ছোট হয়েছ।

মনে হল, হ্যাঁ, ছোটই বটে। অধ্যাপকের তুলনায় প্রায় দেড় ফুট। খানিক আগেও আমি তাঁর মাথায় মাথায় ছিলাম।

সর্বনাশ সম্পর্কে এবার আর সন্দেহ রইল না। অধ্যাপকের আবিষ্কার সম্পর্কেও না। স্পষ্ট বুঝলাম, কী হতে চলেছে। কোথায় যাচ্ছি।

আত্মীয়-বন্ধুদের কথা মনে এলো।

ভীষণ ফাঁকা মনে হল সব কিছু।

—কী ? কেমন লাগছে এখন ?—অধ্যাপক এরই মধ্যে গবেষণার ছু'-একটা খুঁটিনাটি সেরে নিয়েছেন। আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছেন আবার।

আমি কিন্তু ওর চোখে চোখ পড়তেই ঘৃণায় বিরক্তিতে দিশেহারা। ইচ্ছে হল, ছুটে যাই। ওর হাত-পাগুলো ছিঁড়ে ফেলি।

কিন্তু না, কিছুই পারলাম না। একচুলও নড়তে পারলাম না আমি। হাত-পা তখনও অসাড়। মাথা ঝিম-ঝিম করছে। অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে, বমি হবে।

অধ্যাপক বললেন,—হুঁ, কষ্ট হচ্ছে তোমার। বুঝতেই পারছি। কিন্তু কি করবো, বলো ? গোড়ার এই ঝামেলাটা এড়ানো গেল না। অবশ্য খানিক বাদেই দেখবে, সব ঠিক। দিব্যি কথা বলছো, নড়াচড়া করছো।

ভাবলাম,—বটে! বাগে পেয়ে শয়তানও সান্ত্বনা দিচ্ছে এখন! সর্বনাশ আর কা'কে বলে!

হ্যাঁ, এতক্ষণে সর্বনাশের বেশ খানিকটা গভীরে আমি। আগের তুলনায় অর্ধেকেরও কম খাটো। অধ্যাপককে অনেক বড় মনে হচ্ছে। ঠিক সামনেই টেবিলটা আমার মাথা ছাড়িয়ে গেছে।

## ॥ তিন ॥

অধ্যাপক বিড়বিড় করছিলেন,—বুঝতেই পারছো, ক্রমে খাটো হচ্ছ তুমি। সংকুচিত হচ্ছ। খানিক বাদেই তোমাকে উঠিয়ে নেব। সামনের এই টেবিলটার উপর রাখবো। দেখছো, একখণ্ড ধাতু ওখানে! ওই হল রেহীলিয়াম্-এক্স্। ওরই উপর তোমায় রাখবো। তুমি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে ওর ভেতরে যাবে। নিত্য নতুন নতুন জগৎ আবিষ্কার করবে।····হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি করবে। রেহীলিয়াম্-এক্স্-এর ভেতরে গিয়ে দেখবে, কোটি কোটি, কোটি কোটি নক্ষত্রমণ্ডল। ওরা কী? গ্যাল্যাক্সি। রেহীলিয়াম্-এক্স্-এর অণু।····প্রথমে নতুন জগতের তুলনায় খুবই বিরাট থাকবে তুমি। অণুদের তাই খুব ছোট মনে হবে। ক্রমে দেখবে, বড় হচ্ছে ওরা। কেননা, তুমি কেবলই ছোট হবে ····এবার পরমাণুদের একটিকে বেছে নাও। অর্থাৎ কিনা, সুবিধেমতো একটি নক্ষত্র বেছে নিয়ে তার কোনো ইলেকট্রন বা গ্রহের উপর নামো। সেখান থেকে অন্য নক্ষত্রমণ্ডলে যাও আবার। এবং তারপর আবার অন্যটাতে। ভাবছো, কেমন করে যাবে? কেমন? তাই না? আসলে কী জানো, তোমাকে কষ্ট করে যেতে হবে না। জগৎই তোমার সামনে আসবে। যে গ্রহে তুমি গেলে, দেখবে, ক্রমশ ছোট হতে হতে তার অণুর জগতে যাচ্ছ তুমি; এবং তারপর যাচ্ছ পরমাণুর জগতে। সেখান থেকে আবার····

আবার কোথায়? কতদূর?—সব যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। ক্ষণিকের জন্যে চিন্তাশক্তি হারালাম।

অধ্যাপক থামেন নি তখনও। পরমাণুর ভেতরকার মহাজগৎ এবং তারপর তারও ভেতরকার জগৎ ব্যাখ্যা করতে করতে বলছেন, —অবশ্য সবই অনুমান। আসলে কী দাঁড়াবে, জানি না। তবে হ্যাঁ, সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে যোগ রাখবো। তুমি কী ভাবছো, তা এই ল্যাবরেটরীতে বসেই জানবো।....হয়তো বলবে, কী করে? জবাব, অতি সহজে। জানো নিশ্চয়, চিন্তারও তরঙ্গ আছে। ঠিক আলোকতরঙ্গের মতোই ইথার ধরে ওরা যায়। ওরাও শক্তি। তবে কিনা, অদৃশ্য; অধরা। এখন ঐ শক্তিকে আমি যদি ধরতে পারি তো চিন্তা নিয়ে চিন্তার আর কিছু থাকে না। কেমন? তাই তো?

বলেই এক মুহূর্ত থামলেন অধ্যাপক। পুরনো অভ্যাসবশে আমাকে যেন কিছু বলবার সুযোগ দিলেন।

কিন্তু আমি কী বলবো! তখনও যে বোবা! অসহায়ভাবে অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

উনি বলতে লাগলেন,—টেবিলের উপর ঐ বাক্সটা দেখছো? ওতে আছে জটিল কিছু যন্ত্রপাতি। চিন্তা-তরঙ্গকে ধরবার পাকা ব্যবস্থা। অবশ্য সবরকম চিন্তা নয়। দেখা এবং শোনা থেকে যাদের জন্ম, শুধুমাত্র সেগুলো। হ্যাঁ, আপাততঃ তাদের নাগাল পেলেই যথেষ্ট। আমার মাথার এই টুপিটা সেরকমভাবেই তৈরি। বাক্সের 'কয়েল'গুলো চিন্তাতরঙ্গকে লক্ষ লক্ষগুণ বড় করবে। এবং এদেরই দৌলতে ঠিক ওরা ধরা পড়বে। পড়বেই। তা ওরা যত ছোট হোক না কেন।

ভাবছিলাম,—মরুক গে। যা খুশি হোক চিন্তা-তরঙ্গের, যায়-আসে না। ভাবনা নিজেকে নিয়ে। আমার নিজের কী হবে? অধ্যাপক তো বললেন, আমার চেনা-জানা জগতের মতোই নতুন এক জগতে যাচ্ছি। তাই যদি হয় তো ওখানে বাঁচবো কী করে? ওখানকার বিরাট মহাশূন্যে কী করে থাকবো?

ভাবতে ভাবতে দারুণ আতঙ্কে দিশেহারা হলাম আমি। অদ্ভুত এক ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করল।

ওদিকে আরও খাটো হয়েছি ততক্ষণে। মাত্র চার-পাঁচ ইঞ্চিতে এসে দাঁড়িয়েছি। অধ্যাপককে দৈত্যের মতো ঠেকছে। আর ল্যাবরেটরীর ছাদকে ঠেকছে আকাশের মতো।

আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে অধ্যাপকেরও অসুবিধে হচ্ছে এখন। অনেকটা ঝুঁকে পড়েও ঠিক যেন আমার নাগাল পাচ্ছেন না উনি।

অধ্যাপক এ-সমস্যার সমাধান করলেন অতি সহজে। হঠাৎ আমাকে মুঠি করে ধরে টেবিলের উপর রাখলেন।

আমি ভয় পেয়েছিলাম খুব। আর-একটু চেপে ধরলে গুঁড়িয়ে যাবো, আর আলতোভাবে ধরলে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙ্‌বো, মনে হয়েছিল। এমনকি একবার এ-ও মনে হয়েছিল যে, আমি কোনো দুষ্প্রাপ্য পোকা। অধ্যাপক শুধুমাত্র গবেষণার খাতিরে আমায় জীইয়ে রাখছেন।

—কী? ভয় পেলে?—আবার শুরু করলেন উনি,—রাগ করলে? কিন্তু কেন?…তুমি ভাগ্যবান বরং! এত বড় একটা সুযোগ তোমার মুঠোয়! পরমাণুর জগতে তুমিই প্রথম অভিযাত্রী। এ কী সোজা কথা? দুনিয়ার কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে? এমনকি আমিই পেরেছিলুম?

ইচ্ছে হল যে বলি, তুমিই তো নষ্টের গোড়া। নিজে দিব্যি আছ; আর সহকারীকে ঠাউরেছ পোকা।

কিন্তু না, এবারও বলা গেল না কিছু। ধৈর্য ধরে শুনতে হল। অধ্যাপক আমায় মনের কথা জেনে নিয়ে যেন কৈফিয়ৎ দিলেন,—ছাখ, তোমার ভাগ্যকে ঈর্ষা করি আমি। নতুন জগতে সকলের আগে নিজে যেতে পারলুম না, এ কী আমার কম দুঃখ!

ভাবলাম,—দুঃখ? শয়তানেরও শীতগ্রীষ্ম আবার? আলো-আঁধার? বলে কী?

ওদিকে অধ্যাপক অনেক কথা বলছিলেন তখন,—তবে হ্যাঁ, ত্রুটি কোথাও রাখিনি। সব কিছুই একরকম নিখুঁত। এত

কিছু পদার্থ থাকতে রেহীলিয়াম্-এক্স্‌কে নিয়েছি। কিন্তু কেন জানো ?

—কী করে জানবো ?—বলা উচিত ছিল আমার। ইচ্ছে হচ্ছিল,—সামনের, ঐ রেহীলিয়াম্-এক্স্‌কে তুলে নিয়ে অধ্যাপকের মুখে ছুঁড়ে মারি।

কিন্তু না, পারলাম না। ওটা আমার তুলনায় অনেক ঝড় তখন। আর আমিও একেবারেই অসহায়।

—রেহীলিয়াম্-এক্স্ নিয়েছি, তার কারণ,—অধ্যাপক নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিচ্ছিলেন,—এর অণুগুলো অন্য সব পদার্থের তুলনায় ঢের ঠাসা। অর্থাৎ কিনা, নক্ষত্রমণ্ডলগুলো পরস্পরের থেকে দূরে নয় খুব।....অবশ্য না-ই বা হল দূরে। আলোক সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে ছুটেও হাজার বছরে ওদের নাগাল পায় না, আর তুমি! না না, ও জগতের শেষ কোনোদিনই তুমি পাবে না। তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা। ভয় নেই, যাবো আমিও। এই একই রেহীলিয়াম্-এক্স্-এ আমিও অভিযান করবো। তবে এখন নয়, কিছুদিন বাদে। আগে তুমি তো যাও। ফর্মুলার অদল-বদল দরকার কিনা, পরীক্ষা করি। তারপর দেখা যাবে।

অবশ্য দেখা মানে, একটু থেমে আবার তিনি বললেন,—তোমার মুখোমুখি হওয়া নয়; নতুন জগতে যাওয়া শুধুমাত্র। সে-জগৎ বিরাট। বিশাল। কোটি কোটি কোটি কোটি নক্ষত্র সেখানে; কোটি কোটি গ্রহ। সেখানে আমি যে গ্যালাক্সি বেছে নেবো, তুমি তা না-ও নিতে পারো। আবার আমি যে নক্ষত্র-পরিবারে যাবো, তুমি তা থেকে অনেক দূরে থাকতে পারো।....যদিও সবই অনুমান আমার। সব কল্পনা। আসলে কী দাঁড়াবে, তা তুমি যেমন, আমিও ঠিক তেমনি জানি না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা; উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোকে এড়িয়ে চলো। যারা অনুজ্জ্বল, অবতরণের জন্যে শুধুমাত্র তাদেরই গ্রহগুলো বেছে নিয়ো। মনে রেখো, অতি দ্রুত সংকুচিত হচ্ছ তুমি। কয়েক ঘন্টার বেশি কোনো জগতেই তুমি থাকবে না।

ভাবলাম,—কে জানে! হয়তো তাই। এখন দু' ইঞ্চির চেয়েও ছোট আমি। তখন হয়তো আরও কোটি কোটি গুণ ছোট হবো।

এদিকে অধ্যাপক আমায় ধরেছেন আবার। টেবিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে রেহীলিয়াম্-একস্-এর উপর রেখেছেন। আমার অসাড় ভাবটা ক্রমেই যেন কেটে যাচ্ছে। নড়তে-চড়তে পারছি এবার। হাত-পা নাড়তে পারছি।

—অধ্যাপক! অধ্যাপক! —প্রাণপণে আমি এবার চীৎকার করে উঠলাম।

অধ্যাপক আমার উপর নুয়ে পড়ে কান পাতলেন।—মহাকাশের ফাঁকা জায়গাগুলোতে কী হবে? —আমি বললাম,—কেমন করে বাঁচবো মহাশূন্যে? অক্সিজেন কোথায়? তাপ কই?

—ছাখ, তাপ নিয়ে ভেবো না; —অধ্যাপকের কথাগুলো বজ্রনির্ঘোষের মতো শোনাল। মনে হল, আমার কানের পর্দা মুহূর্তে ফেটে যাবে। আত্মরক্ষা দরকার।

তাড়াতাড়ি দুহাতে কান ঢাকলাম। আর অধ্যাপকও ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নিলেন।

—তাপ নিয়ে ভেবো না,—এবার অনেক নিচু পর্দায় শুরু করলেন তিনি,—মহাকাশের কথা উঠলেই ও-সমস্যাটা আমরা বাড়িয়ে দেখি। আর তাছাড়া, তোমার বেলায় ও তো কোনো সমস্যাই নয়। 'শ্রিন্‌ক্স্' তাপ-উৎপাদন করবে। অক্সিজেনও যোগান দেবে।

শুধালাম,—সত্যি? না সান্ত্বনা?

অধ্যাপক আমার কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে ধীর ও শান্তভাবে বললেন,—সত্যি। সব সত্যি। দেখে নিয়ো। তিরিশ বছরের গবেষণা কি ভুল হতে পারে? না কি এত বড়ো একটা ব্যাপার এড়িয়ে যেতে পারি? তবে হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভুগিয়েছে খুব। দীর্ঘদিন এ-নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছে।

শুধালাম,—মাথা ঘামিয়েছেন তো এতদিন বলেন নি কেন? আমার সর্বনাশ করবেন বলে?

অধ্যাপক খুব যেন অবাক এবার।

—ছিঃ! ছিঃ! এ তুমি কী বলছো!—তিনি জবাব দিলেন,—এ তো কল্যাণ! বিরাট সৃষ্টির মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ!

আর সুযোগ!—দুঃখে বেদনায় আমি তখন হতবাক। রেহীলিয়াম্-এক্স্-এর উপর নড়চড়া করতে ভয় হচ্ছে। এক ইঞ্চির চেয়েও ছোট হয়েছি ততক্ষণে।

অধ্যাপক বুঝলেন, সময় নেই বেশি! তাড়াতাড়ি বিদায়-সম্বর্ধনাটা সেরে রাখা যাক। তাই এক হাত দিয়ে আমায় ওঠালেন তিনি। অন্য হাতের উপর রাখলেন।

—বিদায়! —তাঁর ঠোঁট নাড়া দেখে আমি বুঝলাম।

তিনি কি ভয় পেয়েছিলেন খুব? জোরে বললে আমার কষ্ট হবে, বুঝতে পেরেছিলেন?

জানি না। তবে ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ভয় ছিল আকাশ-ছোঁয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রতি মুহূর্তেই ভয়।....এই বুঝি অধ্যাপকের হাত থেকে পড়লাম! এই বুঝি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি!

—বিদায়! —আবার তিনি ঠোঁট নাড়লেন; এবং ঠিক পর-মুহূর্তেই রেহীলিয়াম্-এক্স্-এর উপর রাখলেন আমায়।

আমি, বলতে কী, স্বস্থানে ফিরে আসতে পেরে খুশী।

এখন আর পড়বার ভয় নেই। রেহীলিয়াম্-এক্স্-এর ওপরটাকে বিরাট মনে হচ্ছে। বিরাট কোনো উঠোনের মতো। আর অধ্যাপককে মনে হচ্ছে দানব; আকাশ আড়াল করে অতিকায় কিছু।

ল্যাবরেটরীর দেয়ালগুলো এখন আর চোখে পড়ছে না। এত দূরে সরে গেছে ওরা যে সব কিছু ধূসর ঠেকছে।

শেষবারের মতো আমার এতকালের চেনা জগৎটির দিকে তাকালাম।—না, কিছুই চোখে পড়ল না ঠিক। রেহীলিয়াম্-এক্স্‌কে বড় বেশি এবড়ো-খেবড়ো মনে হল। যেন ভীষণ উঁচু-নীচু, আমার দৃষ্টিকে আড়াল করছে। শুধুমাত্র একদিকে পুরোপুরি আড়াল

হয়নি দৃষ্টি। ঝাপসা চোখে পড়ছে, পর্বতের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক।

ভাবলাম, রেহীলিয়াম্-এক্স্-এর কিনারায় যাই ; সব কিছু চোখে পড়বে। কিন্তু হায়! গিয়ে কী দেখলাম!

যেন পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে। খাড়া, রাক্ষুসে এক পর্বত। একটু ভুলচুক হলেই একেবারে তলায়। মানে, ঐ টেবিলটার উপর।

ঠিক সেই মুহূর্তে কেমন দেখাচ্ছিল ওটা?

আশ্চর্য! অদ্ভুত! বিরাট কোনো প্রান্তর যেন। ধু-ধু করছে। গাছপালা নেই, ঘরবাড়ি নেই। সমতল, মসৃণ।

আঁৎকে উঠলাম। ভয় হল, বেশিক্ষণ ওখানে দাঁড়ালে ছিটকে পড়বো। সোজা নেমে যাবো পাতালপুরীতে।

সরে এলাম তখুনি। কিনারা থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

এখন রেহীলিয়াম্-এক্স্‌কে আগের তুলনায় অনেক বেশি এবড়ো-খেবড়ো মনে হচ্ছে। শুধু এবড়ো-খেবড়োই নয়। মনে হচ্ছে, যেন ছোটবড় অজস্র পাহাড় চারিদিকে সারি বেঁধে—আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে।

কী ওগুলো? কোথেকে এলো?—বুঝতে চেষ্টা করলাম। মনে হল, ওগুলোই রেহীলিয়াম্-এক্স্-এর উপরকার দাগ বা আঁচড়। ছোট হয়েছি বলে অমন দেখছি।

সাবধানে এগোলাম। দুই পাহাড়ের মাঝখান ধরে। জায়গাটা প্রায়-সমতল। কিন্তু তবু, খুব সতর্ক আমি। পা টিপে টিপে চলছি।

খানিকদূর চলতেই দেখি, অন্ধকার সামনে। চারিদিকে ঘুট-ঘুটে কালো।

ভয় হল প্রথমটায়;—তবে কি রেহীলিয়াম্-এর জগতে রাত্রি নামছে?....কিন্তু তা কী করে হয়!....বাতাস আছে এখানে, ধুলোবালি আছে। এখানে দিন-রাত্রির সীমারেখা এত স্পষ্ট হয় কী করে!

থমকে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি, হঠাৎ দেখি, অন্ধকারের রেখাটা সরে আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই দিকে আসছে।

ক্রমে অন্ধকার গ্রাস করল আমায়। আমি যেন কালোর রাজ্যে নির্বাসিত হলাম। মুহূর্ত পরেই দেখি, আশ্চর্য! অন্ধকার কেটে গেছে। আমার চারিদিকে ঝলমল করছে আলো।

ভাবছিলাম,—এসব কী? ভোজবাজি? ভুল দেখছি আমি? স্রিন্‌কস্‌-এর দৌলতে দিশেহারা হচ্ছি?—

এমন সময় হঠাৎ এক উত্তর মনে এলো। যেন যুক্তি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল,—না না, ভোজবাজি এ নয়। নেহাৎই স্বাভাবিক কিছু। এ হল অধ্যাপকের ছায়া। যেমন নড়লেন উনি, ছায়াটাও তেমনি সরে গেল। ভাবলাম, ভদ্রলোক এ-জিনিসটা তলিয়ে দেখেন নি হয়তো। দেখলে আরও একটু সতর্ক হতেন।

এদিকে আমি কিন্তু খুব সতর্ক। প্রতি মুহূর্তেই। পথে খানাখন্দ পড়ছে। সাবধানে এড়াচ্ছি। জায়গায় জায়গায় বিরাট ফাটল হাঁ-করে আছে। হুঁশিয়ার হয়ে ডিঙোচ্ছি।

কিন্তু কতক্ষণ আর ডিঙোব! ফাটল আর খানাখন্দগুলো বড় হতে লাগল ক্রমেই। আশেপাশের পাহাড়গুলোকে মনে হল, আকাশছোঁয়া প্রহরী; দুর্গম, দুর্ভেদ্য।

ভাবলাম, এক কাজ করি। ছোটাছুটি বন্ধ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়াই একটু। ক্রমে এ-জগতের চেহারাও বদলাবে; এবং আমি হয়তো অন্য জিনিস দেখবো।

অন্য জিনিস?....হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখলাম বৈকি। সেদিন অল্প একটু অপেক্ষা করতেই যা দেখলাম তা ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। আতঙ্কে-বিস্ময়ে দম বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয়, ঐ তো! একেবারে সামনেই সে। আসছে।

## ॥ চার ॥

কেমন করে তাকে বোঝাব? সেই ভয়ঙ্করকে! সব কি ছাই মনে আছে! তার বিদ্‌ঘুটে চেহারার সব খুঁটিনাটি!

তবে হ্যাঁ, চেহারার খানিকটা আজও মনে পড়ে।—

তার গায়ের রং মোটামুটি সাদা। নীল আভা শুধুমাত্র গায়ের ভাঁজগুলোতে। ঠিক গাঢ় নীলও নয়, ফিকেমতো। রূপবান বা রূপসী কেউ ভয় পেলে যতটুকু নীল হয়, ততটুকু।

কী বললাম? রূপ?....না বললেই ভাল ছিল। ঐ কিম্ভূত-কিমাকারকে দেখলে রূপের অস্তিত্ব সম্পর্কেই যে সন্দেহ জাগে!

ওর দেহটা ছিল চাকতিমতো। তলার দিকে দু'সারি পা। আর উপরের দিকে শত শত গজাল যেন। উল্টো করে বসান। যেন যে কোনো মুহূর্তে শিকারকে ফুটো করবার অপেক্ষায়।

ভীষণ কুৎসিত ওগুলো। চোখে পড়তেই শরীর রী-রী করে উঠল। মনে হল, ওরাই সব নয়, আরও আছে। জানোয়ারটার দেহে শুঁড়ও অজস্র। কিলবিল করছে চারিদিকে। কয়েক ডজন সরু লিকলিকে সাপ ওর দেহ নামক গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে যেন। ঠিক আমার ওপরেই দাপাদাপি করছে।

তাড়াতাড়ি সরে গেলাম একটু। জন্তুটার দিকে আবার তাকালাম।—না, ওর মুখচোখ কিছুই ছিল না। সাপের মতো শুঁড়গুলো দিয়ে ও যেন দেখাশোনা চালাচ্ছিল। ভীষণদর্শন গজালগুলো দিয়ে ও ঘ্রাণ নিচ্ছিল আমার।

আর একটু সরে এলাম। জন্তুটাও সরল। সঙ্গে সঙ্গেই। কয়েকটা শুঁড় আবার এগিয়ে এল আমার দিকে। একটা তো বলতে গেলে আমাকে স্পর্শই করল।

আমি বিস্ময়ে-আতঙ্কে দিশাহারা। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। কিন্তু যাবো কোথায়? কোন্‌দিকে? এখানে-সেখানে বিরাট ফাটল রাক্ষসের মতো হাঁ-করে। ফাটলের গা ঘেঁষেই আবার খাড়া পাহাড়।

খানিকদূর ছুটে ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগলাম। দম নেবো বলে দাঁড়ালাম একটু।— কিন্তু দাঁড়াবার কি ছাই জো আছে! জানোয়ারটা তখনও পিছু পিছু। ঠিক ছায়ার মতো আমায় অনুসরণ করছে।

আবার ছুটলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঠাসা এক ফাটলকে পাশ কাটিয়ে, আকাশছোঁয়া ভীষণ এক পর্বতকে পেছনে ফেলে.

এবড়ো-খেবড়ো পথ। বিশ্রীরকম উঁচুনীচু। ছুটতে ছুটতে কতবার যে অল্পের জন্যে বেঁচে গেলাম! কতবার যে পড়ি-পড়ি করেও টাল সামলালাম!

জীবনে অত জোরে কোনোদিন ছুটিনি। ছুটবো, স্বপ্নেও ভাবিনি।

কী জানেন, ঐ ছুটবার অবসরেই হঠাৎ একবার মনে হল আমার, আসলে সে একটা জীবাণু। 'স্রিন্‌ক্‌স্‌'-এর দৌলতে আমি ছোট হয়েছি বলে তাকে ঐরকম দেখাচ্ছে।

কিন্তু ও কোথায়? আমার ধারে-কাছে এখনও?

ভয়ে ভয়ে দাঁড়ালাম একটু। ভালো করে চারিদিক একবার দেখে নিলাম। হঠাৎ মনে হল, খুব কাছেই সে। আমাকে পাশ কাটিয়ে একটু যেন এগিয়ে গেল।

ভাবলাম, যাক, বাঁচা গেছে! আপাততঃ হাঁপ ছাড়ি একটু; বিশ্রাম করি।

খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। এতক্ষণ ধরে অক্সিজেনের যে ঘাটতি চলছিল, তা পূরণ করবো বলে তৎপর হয়ে উঠলাম হঠাৎ।

কিন্তু হায়! এই তৎপরতাই কাল হল। জন্তুটা আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল বুঝি। খানিকদূর এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। পিছন ফিরল। এবং ঠিক পরমুহূর্তেই তেড়ে এল আমার দিকে।

আমি আবার ছুটলাম। এবারে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য। ছুটতে ছুটতে বিরাট এক খাদের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

জন্তুটাও এগোচ্ছিল ঠিক। খাদের গা-ঘেঁষে, সন্তর্পণে। ভাবলাম, এক কাজ করি। দম বন্ধ করে দাঁড়াই একটু, শত্রু আমার হদিস পাবে না।

দাঁড়ালাম। এবং আশ্চর্য! ওতেই কাজ হল। শত্রু কেমন যেন দিশাহারা হল হঠাৎ। আমাকে পেছনে ফেলে ছুটল।

আমার ফুসফুস তখন ফাটবার দাখিল। খানিকক্ষণ দম বন্ধ থাকায় অবসর নিতে উদ্যত।

কী আর করি! শত্রু খানিকদূর এগোতেই চোরের মতো নিঃশ্বাস নিলাম। যেন কোনোমতেই ও শুনতে না পায়। আমার গতিবিধির ঠাওর না পায়।

ভাগ্য ভালো, বলতেই হবে। তখনকার মতো রেহাই পেলাম। মনে হল, শত্রু আর ধারেকাছে নেই। আমি নিশ্চিন্ত।

প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলাম এতক্ষণে। আশেপাশের পাহাড়-পর্বত আর খানাখন্দগুলোর দিকে তাকালাম।

দুঃখে হতাশায় মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল।

ছিঃ ছিঃ! এ আমি কোথায় এসেছি! কোন্ জগতে!

এখানে চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, গহ্বর আর ফাটল। পাহাড়গুলো আগের তুলনায় আরও উঁচু মনে হচ্ছে এখন।

কত উঁচু?

না না, সে উচ্চতা গজ-ফুট দিয়ে বোঝান যায় না। এমনকি মাইল বা কিলোমিটার দিয়েও নয়। সে যেন ভুবনজোড়া কিছু। আকাশ ভেদ করে নক্ষত্রলোকের দিকে চলে গেছে।

আমার ঠিক সামনেই একটি ফাটল। জমাট অন্ধকারে ঠাসা আস্ত কোনো মহাসমুদ্র যেন। ডিঙোব ওকে? ভাবতেই হাসি পেল। নিজের উপরেই করুণা হল। ঠিক করলাম, ছোটাছুটি করে লাভ নেই। অপেক্ষা করি বরং। দেখি, শেষ অবধি কী দাঁড়ায়।

কিন্তু কতক্ষণ আর দেখা যায়! বিশেষ করে চুপচাপ, একা একা। ধৈর্যেরও সীমা আছে।

শেষটায় আর পারলাম না। হাঁটতে শুরু করলাম আবার। বিরাট এক পর্বতের গা-বেয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম।

কতক্ষণ এগিয়েছি, খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হল, খুব কাছেই দানব একটা; রাক্ষুসে, ভীষণ। ফাটলের অন্ধকার বেয়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠছে।

কে ও? সেই জীবাণু? না কি অন্য কিছু?

ভালো করে তাহাকেই সন্দেহ হল, হয়তো বা সে-ই। এর মধ্যে আমি আরও খানিকটা ছোট হয়েছি বলে এইরকম দেখাচ্ছে।

কিন্তু সে আমার দিকে ফিরল কেন আবার? শুঁড়গুলোকে মেলে ধরে কেন আবার সেই পুরনো খেলা শুরু করল?

তবে কি টের পেয়েছে? আমি এখানে, কোনোক্রমে তা জানতে পেরেছে?

নিঃশ্বাস বন্ধ করলাম আবার। উল্টোদিকে ছুটলাম।

খানিকদূর ছুটতেই দেখি, চলমান একটা পাহাড়। আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ভাবলাম, যাক; এবারে নিশ্চিন্ত। দানবটা আমার অস্তিত্ব টের পেলেও ঠিক কোথায় আছি, তা বুঝতে পারেনি। কারণ, আমি ওর তুলনায় অনেক গুণ ছোট তখন।

ঠিক কত গুণ ছোট? ক'শো গুণ? আকাশ-পাতাল ভাবছি; এগিয়েছি খানিকদূর, এমন সময় দেখি, দানবটা আবার আসছে। আমাকেই তাক করে যেন এগোচ্ছে।

মনে হল, এবার আর রক্ষে নেই। আমার সামনে তো বটেই, ডাইনে এবং বাঁয়েও ফাটল; সাধ্যি নেই যে লাফ দিয়ে ওদের ডিঙোব।

অগত্যা ভাগ্যের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিলাম। পাহাড়ের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লাম কোনোমতে।

উবুড় হয়ে শুয়েছি। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি, দানবটা গেল কিনা। এমন সময় হঠাৎ মনে হল, শিয়রে শমন; সর্বনাশ একেবারে সামনেই। দানবটা আমাকেই ডিঙোচ্ছে।

ঠিক কতক্ষণ ধরে সে ডিঙোল? কত মিনিটে?

না না, আজ আর ওসব মনে নেই। আজ শুধুমাত্র তার দু'সারি পা'র কথা মনে পড়ে। প্রতিটি আমার চেয়ে অন্তত: বিশ গুণ বড়।

ভাবছিলাম, এই বুঝি গুঁড়িয়ে গেলাম! পা ঠিক আমার উপরই

পড়ল বুঝি!—এমন সময় দেখি, সেই রাক্ষুসে শুঁড়গুলো লকলক করছে আবার। সামনে পেছনে সর্বত্র বিভীষিকার জাল বুনছে।

হঠাৎ একটি শুঁড়ের সঙ্গে সংঘর্ষ হল আমার। হাতের খানিকটা কেটে গেল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম। গড়িয়ে পড়তে পড়তেও অতি কষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে।

দানবটা ততক্ষণে আমায় ডিঙিয়েছে; সামনেই ছিল যে বিরাট ফাটল, তার ওপারে চলে গেছে।

ভেবে পেলাম না, কেমন করে সে ওটা ডিঙোল। আকারে কত বিরাট হলে তা সম্ভব!

এদিকে আমার হাত টনটন করছে। পাহাড়ের গা ধরে অতি কষ্টে ঝুলে আছি। সামনেই বিরাট খাদ। অন্ধকার, ভয়াবহ

শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না। হাতটা মুহূর্তের জন্যে আলগা হতেই অন্ধকার বেয়ে নামতে লাগলাম।

মনে হল, এই শেষ। হারিয়ে যাচ্ছি, যেখান থেকে কোনোদিন কেউ ফেরে না।

আপনার থেকেই চোখ বন্ধ হল। প্রতি মুহূর্তে চরম কিছু একটার প্রতীক্ষায় রইলাম। কিন্তু না সে-রকম কিছু ঘটল না। যেমন নামছিলাম, ঠিক তেমনই নামতে লাগলাম।

আশ্চর্য! নামছি বলে কষ্ট নেই এতটুকু। ক্লান্তি নেই। মনে হচ্ছে যেন ভেলায় উঠেছি। দিব্যি নিশ্চিন্তে শূন্যপথ পাড়ি দিচ্ছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, পাড়িই বটে। আসলে নামছি, না উঠছি, সামনে এগোচ্ছি কি পেছনে হটছি, কে বলবে। নামার কথা যে বললাম, তা তো আমার অনুমান শুধু। ওখানে নামছি, না বলে উঠছি বললেই বা কে ঠেকায়!

কৌতূহল হল খুব। ভাবলাম, দেখাই যাক না; কোথায় চলেছি।

ভয়ে ভয়ে চোখ খুললাম একবার। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম।

মনে হল, খুব কাছেই কোনো দেয়াল। পাথরের হয়তো।

দেয়ালটায় হাত রাখলাম একমুহূর্ত। ওপর থেকে নীচে নামছি, বোঝা গেল।

কিন্তু বুঝলেই বা কী! প্রতি মুহূর্তে জগৎ যার কাছে বদলাচ্ছে, তার লাভ কতটুকু?

বিরক্ত হয়ে দেয়ালটার গায়ে লাথি মারলাম একটা এবং ঠিক পরমুহূর্তেই আমি যেন অনেকখানি দূরে ছিটকে এলাম।

কোথায় এলাম? কতদূর?

কিছুই জানি না। শুধু জানি, এলাম। আসছি। অনবরতই আসছি। মুহূর্তের জন্যেও আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই।

কতক্ষণ এইরকম চলেছিল, ঠিক জানি না। তবে মিনিট কয়েক তো নিশ্চয়ই এবং নিশ্চয় ঐ সময়টুকুর মধ্যে আমি আরও অনেক ছোট হয়েছিলাম। কেননা, খানিক বাদেই দেখলাম, নতুন এক জগৎ; চারিদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরেছে।

দেখলাম, ছোটবড় কী সব বস্তু আশেপাশে। ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে সব। যেন এসে আমারই উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

অদ্ভুত এক আলো ঠিকরে বেরোচ্ছিল ওদের থেকে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ওরা ঠিক এক আকারের নয়; কোনোটা আমার মতো, আবার কোনোটা আমার তুলনায় ঢের বড়। ভয় হল, ওদের চাপে গুঁড়িয়ে যাই যদি?

তখুনি ঠিক করলাম, সরিয়ে দেবো ওদের। আমার আশপাশ থেকে সাধ্যমত হটিয়ে দেবো।

কিন্তু না, পারলাম না। মনে হল, ওরা যেমন আমিও ঠিক তেমনি মহাশূন্যে ভাসছি। ওরা ঠিক ওদের নির্দিষ্ট পথটি ধরে চলছে। সরে আসছে না এতটুকু। ভাবলাম, এ একদিক থেকে ভালোই। কত জগৎ ওখানে, কে জানে! ওদের নাগাল পেলে কিছু জগৎ তো ধ্বংস হত। আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও হত। আকাশ-পাতাল আরও কত কী ভেবেছিলাম সেদিন! মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছিলাম মহাসৃষ্টির রূপবদল!

কত রূপ, কত রহস্য সেখানে! ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ হচ্ছে যত ছোট হচ্ছি, সে জগতের চেহারাও তত বদলাচ্ছে।

খানিক বাদেই মনে হল, জগৎ-জুড়ে চলছে প্রসারণ। বস্তুপুঞ্জ-গুলো, একটু আগেও যারা ছিল কাছাকাছি, ক্রমেই তারা যেন পরস্পরের থেকে দূরে সরছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, দূরে। দেখতে দেখতে বহু দূরে সরল ওরা। এবং ওদের থেকে ফিকে আলো নয় আর, উজ্জ্বল রুপোলী আভা ঠিকরে বেরোল।

বুঝলাম, ওরাই নীহারিকা;—অসংখ্য পৃথিবীর আবাস, অজস্র সূর্যের খেলাঘর।

ওরা ঘুরছিল। দুরন্ত বেগে। প্রসারণের ফলে ক্রমেই পাতলা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন কুয়াশা। গাঢ় থেকে ফিকে হচ্ছে ক্রমে। ঘূর্ণির দাপটে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। ওই ছড়াবার দলে আমিও। যে নীহারিকাটিকে আশ্রয় করে আছি, তারও বুকে ঘূর্ণি। সেও ছড়াচ্ছে, পাতলা হচ্ছে।

ক্রমে কুয়াশা কেটে গেল। ছোট ছোট গোলাকার জগৎ ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। মনে হল, খানিক আগে যাদের কুয়াশা ভেবেছি, আসলে তা'রা এই জগতেরই সমষ্টি! আমি তাদের তুলনায় বড় ছিলাম বলে এতক্ষণ ঠিক চিনতে পারিনি।

অবশ্য চিনেই বা কী লাভ হল! জগৎগুলো আমার চারিদিক দিয়ে যখন ছুটছিল, তখন কি আদৌ নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি?

না না, মোটেও নয়। তখন প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল আমার, এই বুঝি ধাক্কা লাগল! ওরা ধ্বংস হল!

অবশ্য কেউ কেউ যে ধ্বংস হয়নি, তা বলবো না। আমার আবির্ভাব অনেকেরই সর্বনাশ ডেকে এনেছিল নিশ্চয়।

কিন্তু আমি নিজে কেন সর্বনাশ করি? স্বেচ্ছায় ক্ষতি করি কেন?—তাই সাধ্যমত সতর্ক হলাম। ওদের কারও সঙ্গে ধাক্কা লাগবার উপক্রম হতেই হাত-পা গুটিয়ে নিলাম।

অথচ ইচ্ছে করলেই কত কী করা যেত তখন। কত জগৎকে লাথি মারা যেত, লোফা যেত, আবার কখনও বা ধরে নিয়েই ছোঁড়া যেত! আমার সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, উপর-নীচে সর্বত্র ওরা। ঘুরছে, ছুটছে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে।

আমি কিন্তু সংশয়ে জবুথুবু। দেহের একটা মাংসপেশীও নাড়ছি না; পাছে ওদের ক্ষতি হয় সেই ভয়ে।

এদিকে ওরা দূরে সরল ক্রমেই। যত সময় গেল, ততই আমার সঙ্গে ওদের ব্যবধান গেল বেড়ে।

কিন্তু আমি কী অবস্থায় ছিলাম তখন? দাঁড়ানো না শোয়া? নীচের দিকে মুখ করে? না উপরের দিকে?

কিছুই মনে নেই। কেননা, তখন আমার যা অবস্থা, তাতে উপর-নীচ সব একাকার। যাকে আমি উপর ভাবছি, অন্য কেউ স্বচ্ছন্দে তাকে নীচ ভাবতে পারে। আমি ভেসে চলছিলাম তখন। মহাসৃষ্টির প্রাঙ্গণ ধরে সম্পূর্ণ একা।—খানিক বাদেই সৃষ্টির যে রূপ দেখলাম, মনে হল, মোহিনী মায়ায় সে আমাকে গ্রাস করবে।

## ॥ পাঁচ ॥

দেখলাম, মহাসৃষ্টির মুখোমুখি আমি। ভুবনজোড়া সৃষ্টিযজ্ঞের আমি নীরব দ্রষ্টা। দেখলাম, শত শত সূর্য, অগণিত গ্রহ। ঘুরপাক খাচ্ছে, রঙ্-ছড়াবার খেলা খেলছে।

কত রঙ্, কত বাহার ওদের! আমার চেনাজানা সব রঙ্ তো আছেই, তাছাড়া আরও আছে অজস্র।

ওদের কেউ বা ঘোর লাল, কেউ বেগুনী। কেউ নীল, কেউ বা সবুজ। কেউ হলদে, কেউ সাদা।

কিন্তু এ তো গেল চেনাজানা রঙ্, সকলেরই পরিচিত। অচেনা এবং অপরিচিতদের খবর কে রাখে। বেগুনী আর নীলের মাঝামাঝি, সবুজ আর হলদের পাশাপাশি আরও যে অতগুলো রঙ্ দেখবো

তা কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিলাম! কোনদিন কল্পনাও করেছিলাম, সাতের বদলে সাত হাজার রঙ্ আমার চোখ ধাঁধাবে?

হাঁ হ্যাঁ, হাজার। বাড়িয়ে বলছি না, গুণেও নয়, বলছি অনুমানে। সাধ্যি কী যে সেই রঙের মায়াপুরীতে এক-দুই করে গুনবো! সংখ্যার হিসেব নেবো।

সব হিসেব ওলটপালট হল ওখানে। একবার মনে হল, আমিই ঈশ্বর। ভুবন গড়ছি খুশিমত, ভাঙছি। হাজার সূর্য আমার নির্দেশের অপেক্ষায়। গ্রহরা আমাকে খুশি করবে বলে রঙীন এত। সূর্যরা এত রঙের আমারই ইচ্ছায়।

কত সূর্য ওখানে! কত রকমের!—খুঁটিয়ে বলবো না, আভাস দেব শুধু।

কোনো কোনো সূর্য একক, নিঃসঙ্গ পথিকের মতো। আশে-পাশে কেউ নেই ওদের; আর কোনো সূর্য, গ্রহ বা উপগ্রহ—কেউ নয়। আবার কোনো কোনো সূর্যকে ঘিরে গ্রহের মালা। যেন ছেলেপুলে নিয়ে ভরাট সংসার এক একটি। সভ্যসংখ্যা—দুই থেকে কুড়ি।

সূর্যদের অনেকে জোড়ায় জোড়ায়। একটিকে ঘিরে আর একটির প্রদক্ষিণ-পথ। অনেকে ত্রয়ী, তিন তিনটির আসরে দিব্যি চলমান। সাবধানে ঘুরপাক খাচ্ছে। একে অপরকে প্রদক্ষিণ করছে। এতটুকু নড়ছে না কক্ষপথ থেকে।

এছাড়া, চার-চারটে সূর্যের জটলাও দেখলাম। অদ্ভুত, আশ্চর্য! একটার সঙ্গে অন্যটার বর্ণের মিল নেই, জোটের মিল। যেন শুধুমাত্র পথ-চলার খাতিরে এক জায়গায় ওরা। একে অপরকে সেলাম ঠুকে ঠুকে ঘুরপাক খাবে বলে এত কাছাকাছি।

না না, ভুল বললাম। কাছাকাছি কী আবার! এখনকার হিসেবে যা'ই হোক না কেন, পুরনো হিসেবে তা কোটি কোটি মাইল।

ওদের রঙ্ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ঝলমলে সাদা একটি, ঠিক পরেরটিই আবার ঘোর নীল। সবুজ একটি, অন্যটি কমলা-রঙা।

সাদা এবং নীল সূর্য দু'টি দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরাল থেকে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু সবুজ ও কমলা-রঙার পথ আলাদা। ওরা যেন খাড়া বা উল্লম্ব পথে ছুটছে ; এবং পরস্পরকে প্রদক্ষিণের কাজটাও সেরে নিচ্ছে সেই সঙ্গে।

এই চার সূর্যকে ঘিরে মোট ষোলটি গ্রহ ; ছোটবড় বিভিন্ন আকারের। ছোটরা ভেতরের দিককার কক্ষপথে, বড়রা বাইরেকার।

সূর্যগুলো থেকে আলো পাচ্ছে ওরা। ওদের গায়ে গায়ে যেন সাদা নীল সবুজ ও কমলা-রঙের নিশান উড়ছে।

এই চার-সৌরজগতের মাঝখানটা বড় অদ্ভুত। রঙ্ বেরঙের আলোর বিজয়-বৈজয়ন্তী ওখানে! হাজার ধনুক হাতে নিয়ে কে যেন ওখান থেকে আলোর তীর ছুড়ছে!

মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলাম ঐ আলোর খেলা। মহাসৃষ্টির অঙ্গন ধরে একা ভাসলাম। এখন আর কষ্ট নেই, দুশ্চিন্তা নেই। গ্রহ-নক্ষত্ররা আমার কাছ থেকে বেশ দূরে এখন। যত খুশি হাত-পা নাড়ি না কেন, ধাক্কা খাবার ভয় নেই।

ঠিক করলাম, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করি ; যতক্ষণ না এই চার সৌর-জগতের তুলনায় আরও ছোট হচ্ছি। 'শ্রিন্‌ক্‌স্'-এর কাজ তো চলছেই। আমার সংকোচনই বা থামবে কেন?

শেষটায় ঐ শব্দহীন সঙ্গীহীন মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে চার সৌর-জগতের ষোড়শ গ্রহটিকে মনে ধরল। ভাবলাম, ওতেই অবতরণ করি। কারণ, অন্য সব গ্রহদের তুলনায় ও আমার কাছাকাছি, মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর আকাশে। কে জানে, জীবন ওতে থাকলেও থাকতে পারে।

হাত-পা মেলে দিলাম এবার। চিৎ-সাঁতার দেবার ভঙ্গীতে খানিকদূর এগোলাম। এবার মনে হল, না ; অবতরণের সময় এখনও আসেনি। ষোড়শ গ্রহটির কক্ষপথের চেয়েও আকারে বড় আমি। তাড়াহুড়ো করলে গ্রহটির ক্ষতি হবে। কক্ষপথ থেকে

সরে যাবে সে। তাই আবার অপেক্ষা, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ষোড়শ গ্রহটির দিকে তাকিয়ে থাকা।

অতি দ্রুত সে এগিয়ে এল। আমাকে পাশ কাটাল নিঃশব্দে। দেখলাম, তার গায়ে জলের চিহ্ন। হ্যাঁ হ্যাঁ, জল। স্থলের ছিটে-ফোঁটাও তাতে নেই, তার মেঘের রন্ধ্রপথ দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম।

সে আমাকে পেছনে ফেলে চার-সূর্যের অন্যদিকে চলে গেল। অর্থাৎ, সূর্য-প্রদক্ষিণের দায়িত্ব পালন করল যথারীতি। আমি প্রতীক্ষায় থাকলাম। ঘুরতে ঘুরতে কখন্ সে আমার কাছাকাছি আসবে এবং কখন্ আমি আরও সঙ্কুচিত হব, তারই প্রতীক্ষায় থাকতে হল। স্থির বিশ্বাস ছিল, আবার সে যখন আমার মুখোমুখি হবে তখন নিশ্চয়ই তার উপর নামতে পারবো।

কিন্তু নামা কি সঙ্গত হবে ?—ঠিক সেই মুহূর্তে দারুণ এক সংশয় আমাকে ঘিরে ধরল, -যেখানে শুধু জল সেখানে নেমে লাভ ?

অগত্যা ঠিক করলাম, এগোই আর একটু। পঞ্চদশ গ্রহটিকে দেখি। ডাঙ্গার হদিস পাই যদি। খানিকদূর এগোতেই দেখি, পঞ্চদশ ঠিক আমার বিপরীত দিকে। এগোচ্ছে, দ্রুত। আমাকেই ডাক করে যেন। বুঝলাম, অনেকটা এগিয়েছি চার-সূর্যের জটলার অনেকখানি কাছাকাছি। পঞ্চদশ গ্রহটির কক্ষপথ আমার থেকে এখন মোটেই দূরে নয়। আর তাছাড়া, আমিও প্রচুর সঙ্কুচিত হয়েছি এতক্ষণে ; ছোট হয়েছি। পঞ্চদশ গ্রহটির কক্ষপথকে আমার তুলনায় বেশ বড় দেখাচ্ছে।

কিন্তু ষোড়শের পথ ! কত দূরে এখন ?—

মনে হল, অনেক। আমাদের পুরনো মাপে দু-চার কোটি মাইল ; আর আমার এখানকার মাপে কয়েক শো গজ।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা চলল আবার। চোখে পড়ল, পঞ্চদশ বেরিয়ে আসছে, রঙ্-বেরঙের সৌর আলোর ফোয়ারার ভেতর থেকে।

যত এগোল সে ততই বোঝা গেল, তার বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার। জাফরানী-রঙা।

আমার কয়েক গজ মাত্র দূর দিয়ে সে চলে গেল। আর আমি স্পষ্ট দেখলাম, তাতেও জলেরই ছড়াছড়ি। একটি মাত্র বড় আর কিছু খুদে খুদে দ্বীপকে বাদ দিলে তার সবটাই জল; বলতে গেলে তার দশ ভাগের ন'ভাগ জায়গা।

ঠিক করলাম, না; এতেও নামবো না। অন্য কোথাও দেখি—

এগোলাম পরক্ষণেই। এবার চতুর্দশ গ্রহটিকে লক্ষ্য করে।

এগোতে বেশ খানিকটা সময় লেগে থাকবে। আমিও সঙ্কুচিত হয়ে থাকবো অনেকটা। কেননা, হঠাৎ দেখি, সূর্যের রশ্মিতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। আগের তুলনায় অনেক বড় দেখাচ্ছে সূর্যগুলোকে।

ভাবলাম, ঠিক এই মুহূর্তে সে কোথায়? চতুর্দশ? ভালো করে তাকাতেই দেখি, আসছে। আমার থেকে বড় জোর পঞ্চাশ গজ মাত্র দূর দিয়ে।

সোনালী আর সবুজ আলোয় অবগাহন করতে করতে এল সে। খুব যখন কাছে এল তখন স্পষ্ট দেখলাম, তার আলোকিত দিকটিতে কয়েকটা বড় মহাদেশ। ক্রমে অন্ধকার দিকটা সূর্যের মুখোমুখি হল। আরও কয়েকটা মহাদেশ চোখে পড়ল আমার।

অবশ্য মহাদেশ ওরা নামেই। তখনও আমার তুলনায় কত ছোট ছিল ওরা! গোটা গ্রহটাই ছিল আমার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ভেবে দেখলাম, এখন ওতে নামা উচিত হবে না। বরং নামলে দু'য়েরই সর্বনাশ। গ্রহটির যেমন আমারও তেমনি।

তাই ঠিক করলাম, অপেক্ষা করবো; যতক্ষণ না সূর্য-প্রদক্ষিণ সেরে সে আবার ফিরে আসে।

কিন্তু অপেক্ষা করা কি সোজা কথা? বিশেষ করে ঐ নিঃসীম শূন্যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে! মনের জগৎ কি আর ফাঁকা থাকে?

ঠিক সেই মুহূর্তে কত কী কথা মনে এল। অধ্যাপককে মনে পড়ল।....নিশ্চয় অত দূরে বসেও তিনি আমার ভাবনা-চিন্তাগুলোর

হদিস পাচ্ছেন, আমার মনের কথা পড়ে নিচ্ছেন।....কিন্তু সত্যি কি দূরে তিনি? না কি কাছে? খুব কাছে আমার?

মনে হল, শেষেরটাই ঠিক। হাত বাড়ালেই তিনি আমার নাগাল পাবেন। আমি, আমার সামনেকার এই বিরাট জগৎ সবই তো তাঁর ল্যাবরেটরীর টেবিলের উপর একখণ্ড রেহীলিয়াম এক্স্-এর ভেতর। তাঁর আবিষ্কৃত 'শ্রিন্‌ক্স্'-এর দৌলতে ক্রমান্বয়ে আমি সংকুচিত হচ্ছি বলেই না এই অঘটন!....তবে কি অধ্যাপকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হবে? একের পর এক জগতে অভিযাত্রী হবো আমি? নিখিল বিশ্ব তার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জগৎকে আমার সামনে মেলে ধরবে? আসল খেলার সবেমাত্র শুরু?....ভাবতে ভাবতে আতঙ্কে বিস্ময়ে শিউরে উঠলাম কতবার। অনাগত জগৎগুলোর পরিবেশের কথা ভেবে আঁৎকে উঠলাম। একবার মনে হল, যে-জগতে খানিক বাদেই নামবো, না জানি সে কেমন! জীবন আছে কি সেখানে? হাসি-কান্না, দুঃখ-সুখ আছে? সেখানকার অধিবাসীরা আমাদের চেয়ে উন্নত? আমাকে বন্ধুভাবে নেবে ওরা? না কি শত্রু ভেবে আক্রমণ করবে?

কিছুই বোঝবার জো ছিল না। সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের উপর নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া করবার ছিল না কিছু।

ওদিকে চতুর্দশ গ্রহটি সূর্য-প্রদক্ষিণ সেরে ফিরে আসছে। আমার যেখানে কয়েক মিনিটও পেরোয় নি, ওর সেখানে এক বছর পেরিয়েছে।

দেখতে দেখতে খুব কাছে এগিয়ে এল ও। মহাদেশগুলো এবার আগের চেয়েও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ল।

হ্যাঁ, স্পষ্ট; এবং আগের তুলনায় বড়। কেননা, খোদ গ্রহটিকে আমার পাঁচ গুণ বড় দেখাচ্ছিল তখন।

আসলেও কি পাঁচ গুণ? না কি তার চেয়ে বেশি? —ভাবছি, এমন সময় অদ্ভুত এক টান অনুভব করলাম। মনে হল, চুম্বক যেমন করে লোহাকে টানে, আমাকেও ঠিক তেমন করেই কে যেন টানছে।

—কে ? কে ?—আর্তনাদ করে উঠলাম। বেদনায়, ভয়ে দিশাহারা হলাম কতবার।

কিন্তু না, কেউ আমার কষ্টকে আমল দিল না। আমার কণ্ঠস্বর কেউ শুনল না। সেই বায়ুহীন, শব্দহীন ও প্রাণহীন মহাশূন্যে এমনকি নিজের স্বরও আমি শুনতে পেলাম না।

এদিকে টান বাড়ছিল ক্রমেই। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু কোথায় এগোচ্ছি ? কোন্ জাহান্নমে ?—চরম সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজের অবস্থাটা বুঝতে চাইলাম একবার। এবং ঠিক পরক্ষণেই মনে এল, এগোচ্ছি, চতুর্দশ গ্রহটির দিকে। আমাকে আকর্ষণ করছে ও। মাধ্যাকর্ষণের আওতায় পেয়ে টানছে।

খানিকক্ষণ ওর পিছু-পিছু চললাম ; এবং তারপর টান একটু বাড়তেই ওর রাজ্যি-বরাবর আমার অবতরণ শুরু হল।

আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম ; যাতে আমার পা আগে ওর নাগাল পায়।

হ্যাঁ, পেল ঠিক। প্রথমে বায়ুমণ্ডল, তারপর মাটি। বায়ুমণ্ডলে পা দুটো ঢুকতেই অদ্ভুত এক শিহরণ হল আমার। মনে হল, নতুন জগতে অভিযান এই শুরু।

বায়ুমণ্ডলকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সোনালী আর সবুজে মিলে অপরূপ। মহাশূন্যের কালো কুচকুচে আকাশকে ধীরে ধীরে স্পর্শ করছিল সে। কালোর পাশেই আলোর মায়াজাল বুনছিল।

ওদিকে আমার পা বায়ুমণ্ডল ধরে আরও একটু এগিয়েছে। কঠিন ও গোলাকার কিছুর উপর থমকে দাঁড়িয়েছে যেন।

বুঝলাম, অবতরণ শেষ। গ্রহের মাটিকে স্পর্শ করেছি। কোনো একটি মহাদেশের উপর আমি দাঁড়িয়ে। স্রিন্‌ক্‌স্-এর দৌলতে আমার সংকোচন ক্রমশঃ বেড়ে চললেও গ্রহটি আমার তুলনায় এখনও তেমন কিছু বড় নয়। তাই ওর গোলাকার চেহারাটা ওতে পা-রাখা মাত্রই ঠাওর হচ্ছে।

কিন্তু শুধু পা রেখে লাভ? আমার দেহের বেশির ভাগটাই তখনও বায়ুমণ্ডলের বাইরে। এত বিরাট আমি যে মহাশূন্যের বেশ খানিকটা জায়গা আমার দেহ দখল করে আছে।

মহাশূন্যের দিকে তাকালাম। ঐ চার-চারটি সূর্যের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এত ঝলমলে ওরা যে মনে হল, ভালো করে যদি তাকাই তো চোখ চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যাবে।

অগত্যা গ্রহটির দিকে তাকালাম।

না, ওখানেও সুখ নেই। প্রতিফলিত সূর্যকিরণ থেকে রঙীন আলোর রোশনাই ওখানে। চোখে যেন সূঁচ ফোটাচ্ছে।

অধ্যাপকের সাবধান-বাণী মনে পড়ল,—উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোকে এড়িয়ে চলো। যারা অনুজ্জ্বল, অবতরণের জন্যে শুধু তাদেরই গ্রহগুলো বেছে নিয়ো।

সন্দেহ হল, তবে কি ভুল করেছি? ঝলমলে চার-সূর্যের গ্রহ-রাজ্যিকে বেছে নিয়ে আত্মহত্যা?

না, অতটা ভাবা বোধ করি ঠিক নয়। কেননা, আলোর দাপটে আমার খুব কষ্ট হলেও তা এমন কিছু নয় যে চরম কোনো বিপর্যয় ঘটাতে পারে। তবে হ্যাঁ, কষ্ট হচ্ছিল বৈকি। গরমও লাগছিল খুব।

খানিকক্ষণ বাদে গ্রহটির বুকে অন্ধকার নেমে এল; আর আমারও কষ্ট লাঘব হল খানিকটা।

এই অন্ধকার বা রাত্রির কথাটা আগে মনে আসেনি। গ্রহটি যে আপন অক্ষরেখাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে, ওখানেও যে পর্যায়ক্রমে দিনরাত্রি হয়, প্রথমটায় তা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

শেষকালে রাত্রির নাগাল পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল, যাক! আপাততঃ নিশ্চিন্তি! আলোর আক্রমণ থেকে বাঁচা যাবে, যতক্ষণ না আবার দিন হচ্ছে ততক্ষণ।

ওদিকে দিন হতে হতে আমারও পরিবর্তন হবে নিশ্চয়। আমি আরও খানিকটা সংকুচিত হবো; এবং ঠিক এই কারণেই কষ্টও আগের তুলনায় কম হবে।

আমাদের হিসেবে মিনিট কয়েকও পেরোয় নি ; দেখলাম, যা ভেবেছি হুবহু তাই। গ্রহটিতে দিন হল আবার। কিন্তু আমার কষ্ট কমে গেল আগের তুলনায় অনেকখানি। কারণ, সত্যি, আরও অনেক ছোট হয়েছি ততক্ষণে। মহাশূন্যে আমার দেহের খুব সামান্যই বেরিয়ে আছে।

দেখতে দেখতে রাত্রি নামল আবার ; দিন ঘুরে এল এবং তারপর আবার রাত্রি। এইভাবে দিনরাত্রির আসা-যাওয়া চলল এবং আমিও ক্রমশ ছোট হতে লাগলাম। ক্রমে গ্রহটির বায়ুমণ্ডল আমাকে ঘিরে ফেলল। এদিক-ওদিক থেকে ছুটে এল মেঘ। কিন্তু তবু, মেঘ কত আর! ছিটেফোঁটা বৈ তো নয়। তাই গ্রহটিকে দেখতে অসুবিধে হল না আমার। বরং আকারে তখনও বিরাট ছিলাম বলে তার অনেকটা দূর অবধি চোখে পড়ল। দেখলাম, অদ্ভুত এক জগৎ। এক আশ্চর্য পৃথিবী।

## ॥ ছয় ॥

আশ্চর্য, শুধুই আশ্চর্য ওখানে। আসছে, ঘিরে ধরছে, একের পর এক ; যেন মিছিল করে। আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে আশ্চর্যের সেই রঙ্‌মহল দেখছি।

শুরুতে বুঝতে পারিনি ঠিক। নতুন জগৎটিকে দেখে আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। প্রথম-দর্শনে মনে হয়েছিল, নীচে—অনেক অনেক মাইল নীচে—বিরাট কোনো প্রান্তর। হলুদ রঙ্‌ তার। চারিদিকে অনেক দূর অবধি সে ছড়িয়ে।

খুঁজতে লাগলাম তার সীমানা। বাঁকামতো দিগন্তের ওপারে তাকালাম।—হঠাৎ মনে হল, নতুন কিছু যেন। যেন মুহূর্তের জন্য চোখে পড়ল, শহর-টহর কিছু। দূরে, বহুদূরে। দীর্ঘ, বিরাট তার রূপোলী স্তম্ভগুলো। ঝলমল করছে। চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

বাধ্য হয়ে অন্যদিকে তাকালাম। দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে নিলাম একটু।

ফিরে তাকাতেই দেখি, কিছুই নেই আর। রূপোলী স্তম্ভগুলো নিশ্চিহ্ন।

সন্দেহ হল, তবে কি ভুল দেখছি? অলীক ও অবাস্তব কিছু? 'স্রিন্‌ক্‌স্‌'-এর দৌলতে সংকুচিত হচ্ছি যত, অসম্ভব ততই আমায় ঘিরে ধরছে?

ভালো করে তাকালাম আবার। দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিলাম বহুদূর অবধি।—হঠাৎ দেখি, খুদে খুদে দু'টো লাল ফুট্‌কি; হলুদ-রঙা প্রান্তরের ঠিক উপরেই। যেন আমার দিকে খুব দ্রুত ছুটে আসছে।

দ্রুত কেননা আমি তাকিয়ে থেকেই দেখলাম, ওরা ক্রমশ বড় হচ্ছে। মিনিট কয়েকের মধ্যে রক্তরাঙা দুটি গোলকে পরিণত হচ্ছে।

ভয় হল ভীষণ—তবে কি ওরা মারাত্মক কিছু? অব্যর্থ কোনো মারণাস্ত্র? আমাকে ঘায়েল করবে বলে এগোচ্ছে?

অপেক্ষা করি আবার। চোখের সামনেই গোলক দু'টিকে আরও বড় হতে দেখি।

দেখতে দেখতে খুব কাছে এগিয়ে আসে ওরা। আমাকে একপাশে রেখে খুব সাবধানে ঘুরতে থাকে। আমি নিশ্চিন্ত হই খানিকটা। হঠাৎ করে আমার কোনো ক্ষতি হবে না ভেবে আশ্বস্ত হই। তখনও ওদের তুলনায় আমি বিরাট; দৈত্যের মত আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। ওরা আমাকে পাশ কাটিয়ে ঘুরছে; আর আমি প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্য রাখছি।

খানিক বাদেই ঠাওর হল, ওরা কঠিন কিছু নয়; বরং বায়বীয় আর অস্বচ্ছ। ওদের মতিগতির পেছনে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ কারও হাত আছে।

কার হাত? কে ওদের চালাচ্ছে? আসলে কী ওরা?—ভাবছি। এমন সময় দেখি, গোলক দুটি ঠিক আমার চোখের সামনে ঘুরে ঘুরে কী যেন তল্লাস করছে। ঠিক করলাম, আর নয়, এবারে প্রতিবাদ। অন্ততঃ হাত তুলে প্রতিরোধ একটু।—কিন্তু না, প্রতিরোধ মাথায় রইল। হাত তুলতে না তুলতেই দেখি, অনেকটা দূরে ওরা; বিদ্যুৎবেগে সরে গিয়ে নিরাপদ স্থানে।

অবাক লাগল। ভেবে পেলাম না, কিসের সাহায্যে ওরা চলছে। যন্ত্র-টন্ত্র বা জ্বালানি, কিছুই চোখে পড়ল না।

এদিকে ওরা তখন পরস্পরের খুব কাছাকাছি। যেন শলা-পরামর্শে ব্যস্ত।

সন্দেহ হল, তবে কি আমার সম্পর্কেই বৈঠক ওদের ? জল্পনা-কল্পনা ? ওরা কি নতুন কিছু ফন্দী আঁটছে ?

আর স্থির থাকতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গেই পিছু নিলাম ওদের। যথাসম্ভব সাবধানে পা ফেললাম।

আমার এক একটি পদক্ষেপ মানে এক মাইলের চেয়েও বেশি। কিন্তু তবু ওদের আমি ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেলাম না। যেন চোখের পলকে ওরা মিলিয়ে গেল। যেদিকে শহর আছে বলে আশঙ্কা করছিলাম, ঠিক সেদিকে।

অগত্যা দাঁড়াতে হল। দিগন্তের ওপারে সত্যি কিছু আছে কিনা, নতুন করে তা দেখতে হল।

কিন্তু না, এবারও কিছুই দেখলাম না। বরং দিগন্তকে মনে হল আগের তুলনায় অনেক কম বাঁকা। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এর মধ্যে আমি আরও অনেকটা সংকুচিত হয়েছি, ফলে এ-রকম ঠেকছে। যদিও আমি এখন অনুপাতে কয়েকশো ফুট, তবু একথা ভুলি কী করে যে খানিক আগেও এ-তুলনায় কয়েকগুণ উঁচু ছিলাম এবং ঠিক এ কারণেই দিগন্তের ওপারকেও কিছুটা দূর অবধি দেখছিলাম।

এখন সব কিছুই অন্যরকম ঠেকছে। আশেপাশে, চারিদিকে বিরাট প্রান্তর আমার আরও কাছে এগিয়েছে যেন।

কিন্তু আমি নিজে ? এ কোথায় এগোচ্ছি ? কোন্ জাহান্নমে ?

দুঃখে যন্ত্রণায় হতাশায় ছটফট করছি, ঠিক এমন সময় লাল গোলক দুটি চোখে পড়ল আবার। স্পষ্ট দেখলাম, ওরা যেন দিগন্তের ওপার থেকে আমারই দিকে ছুটছে।

আমি মুহূর্তে সজাগ হই আবার। সাহসে বুক বাঁধি। হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াই।

এদিকে ওরা ছুটছে তখনও। প্রচণ্ড বেগে এগোচ্ছে; ওদের পিছু-পিছু এগোচ্ছে আরও কয়েকটি গোলক।

সন্দেহ হল, তবে কি আমার আবির্ভাবের ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে? গোলক দুটি তা' জানিয়ে দিয়েছে? শহরে গিয়ে খবর দিল ওরা? তাই আরও গোলক আমার পিছু নিল?

কে দেবে উত্তর? এ রহস্যপুরীতে অভিজ্ঞতার মূল্য জমা না দিলে বেফায়দা খবর কে দেবে?

এদিকে গোলকরা এগিয়ে এসেছে এতক্ষণে। চারিদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরেছে। আমাকে কেন্দ্র করে দিব্যি একটি বৃত্ত গড়েছে ওরা। শূন্যে ভেসে ভেসে ওরা ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমি বিমূঢ়। সাবধানে ওদের হালচাল লক্ষ্য করছি, এমন সময় ওরা আমার দিকে হালকা আলোক-রশ্মি পাঠাল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই পাঠাল। একসঙ্গে। মনে হল, আমার সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করতে চায়।

কিন্তু আমি কী করবো? কেমন করে সাড়া দেবো? —কিছুই বুঝতে না পেরে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইলাম।

ওরা কিন্তু বুদ্ধিমান। আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে বৃত্তটিকে আরও খানিকটা ছোট করল। পরস্পরের গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল।

আলোক-রশ্মি তখনও আসছিল। ঠিক আগের মতোই। মনে হচ্ছিল, যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওরা; আমার কাছ থেকে কিছু একটা জবাব চায়।

কিন্তু না, এবারও আমি ওদের নিরাশ করলাম। ওদের উন্নত কায়দা-কানুনের কিছুই বুঝতে না পেরে নির্বাক থাকলাম।

ওরা নাছোড়বান্দা। একের পর এক চেষ্টা চালাল। শেষ পর্যন্ত আলোক-রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করল আমার মাথা-বরাবর।

এবার আমি দারুণ অস্বস্তি বোধ করলাম। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠতেই হাত-পা ছুঁড়ে ভয় দেখালাম ওদের।

ওরা মুহূর্তের মধ্যে খানিকটা দূরে সরে গেল। বাতাসে ভাসতে ভাসতে পরামর্শ শুরু করল যেন। গোলকদের মধ্যে একটির রঙ্-বদল হয়েছে এতক্ষণে। লাল থেকে সে হলদে হয়েছে।

এই বিশেষ গোলকটির কীর্তি দেখে আমি থ। ভাবগতিকে মনে হল, যেন সে ভীষণ ক্রুদ্ধ; অন্য সব গোলকরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে দেখে বিরক্ত। থেকে থেকে লাল গোলকগুলোর কাছে গিয়ে ঘুর-ঘুর করছে সে; আপ্রাণ চেষ্টায় কী যেন বোঝাচ্ছে।

সন্দেহ হল, বোঝাবার বিষয়বস্তু নিশ্চয় আমি। আমার হাত-পা নাড়া দেখে ওদের ভয় পাওয়াটা ঠিক হয়নি, নিশ্চয় এই হল ওর বক্তব্য।

কিন্তু এই রঙ্-বদল কেন ওর? কেন ও লাল থেকে হলদে হল?—নিজের মনকেই প্রশ্ন করি একবার—অতিরিক্ত ক্রোধ আর উত্তেজনার ফলেই কি?

আশঙ্কা হল, হয়তো বা তাই। কেননা, একটু বাদেই দেখলাম, আর একটি গোলক রঙ্-বদল করল। যেন হলদেটির প্ররোচনায় ক্ষেপে উঠল রীতিমত।

সে ক্ষেপল। পরক্ষণেই অন্যরা। সবাই মিলে আবার ঘিরে ধরল আমাকে। বৃত্ত রচনা করে আবার ঘুরতে লাগল।

এবারের বৃত্তটি আগের তুলনায় ছোট। অর্থাৎ, গোলকরা আমার অপেক্ষাকৃত কাছে এখন; বীরদর্পে ঘুরছে, পর্যবেক্ষণ করছে আমাকে।

শূন্য-পথ ধরে কোনোরকম জ্বালানি ছাড়াই ওদের এই চলাফেরা। এ-দৃশ্য দেখে আমার আর সন্দেহ রহিল না যে, ওরা খুব উন্নত প্রাণী। আর যাই হোক না কেন, চট করে আমার কোন ক্ষতি ওদের দিয়ে হবে না।

আমি তাই ধৈর্য ধরি। শান্ত থেকে লক্ষ্য করি সব কিছু।

এদিকে কয়েক মিনিটও পেরোয় নি; দেখলাম, ওরা আবার সেই আলোক-রশ্মি পাঠাচ্ছে। আমাকে তাক করে পরীক্ষা চালাচ্ছে আবার।

আলোক-রশ্মির দৌলতে প্রথমটায় তেমন অসুবিধে হল না। হাতের জায়গায় জায়গায় খুব শীতল একটা অনুভূতি হল শুধু।

খানিক বাদেই দেখি, অনুভূতিটা চোখমুখেও ছড়াচ্ছে। এবং এমন কি মস্তিষ্কের ভেতরেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হচ্ছে। কে যেন খুব ছোট ছোট সূঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে আমার মাথায়।

সন্দেহ হল, তবে কি এইভাবেই আমার অসাড় ও অনুর্বর মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করতে চায় ওরা? সাড়া জাগাতে চায়?

ভাবছি, এমন সময় দেখি, অদ্ভুত এক তন্দ্রা ঘিরে ধরছে আমাকে। ক্রমেই যেন আমার চলাফেরার ক্ষমতা লুপ্ত হচ্ছে।

ভয় হল, তবে কি এরই নাম মৃত্যু? ধীরে ধীরে তার কোলে ঢলে পড়ছি?

চেতনাকে জাগ্রত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। মনে হল, ধীরে অথচ খুব স্পষ্টভাবে তার উপর মুদ্রিত হচ্ছে,—কোত্থেকে তুমি আসছ?

কে আসছে? আমি?—সচকিত হলাম হঠাৎ। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। মনে হল, হ্যাঁ, এরই নাম 'থট্ ট্র্যান্স্ফারেন্স্'—কথা না বলে এবং ভাষার সাহায্য না নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে চিন্তার আদান-প্রদান। এ-গ্রহের জীবরা এরই সাহায্য নিচ্ছে। যোগাযোগ করছে আমার সঙ্গে।

আমি অবশ্য 'থট্ ট্র্যান্স্ফারেন্স্'-এর সঙ্গে আগে থাকতেই পরিচিত। কতবার এ নিয়ে গবেষণায় বিস্ময়কর সাফল্যও অর্জন করেছি। কিন্তু তবু, এ আলাদা। অন্য গ্রহের জীব ভাবনার আদান-প্রদান চালাচ্ছে, আমার কাছে এ একেবারে অভিনব। তাই প্রশ্নটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া মাত্রই খুব সতর্ক হলাম। চেতনার প্রতিটি পরমাণুকে চাইলাম একমুখী করতে। অর্থাৎ, কী করে এখানে এসেছি, তা ভাবতে।

যখন মনে মনে আমার বর্ণনা শেষ হল তখন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আমার চেতনার উপর নিম্নোক্ত ভাবনাটি মুদ্রিত :—

কই! জবাব পেলাম না কিছু। তোমার মন দেখছি শূন্য, আদৌ কাজ করছে না। সত্যি, অদ্ভুত তুমি! এক আশ্চর্য বিদেশী! তোমার মত জীব কোনদিন দেখিনি। কখনও শুনিও নি যে প্রকৃত কোনো কারণ ছাড়াই কেউ অবিরাম ছোট হতে পারে। বলতে পারো, কেন তুমি এখানে? তোমার বাসভূমি কোথায়?

না, বলতে পারলাম না কিছু। মনে মনে বর্ণনা করে আবার ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

ওরা ততক্ষণে আমার মস্তিষ্ককে নিয়ে তোলপাড় করছে। যেন বরফের মত ঠাণ্ডা ছুঁচলো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে ওর কোষগুলো।

আমি আবার চেষ্টা করলাম; অধ্যাপকের ল্যাবরেটরীতে ঢোকার পর-মুহূর্ত থেকে এ-পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তার সবই মনে আনলাম একে একে। কিন্তু না, বৃথা চেষ্টা। ওরা আমার চিন্তা-ভাবনার হদিস পেল না। আদৌ বুঝল না আমাকে। বরং দোষারোপ করল, তোমার চিন্তা এলোমেলো। মন কোথাও নিবদ্ধ নয়। কিছুতেই মনকে তুমি একমুখী করতে পারছো না, ফলে তোমার সব কিছুই ঝাপসা ঠেকছে।

আমি তখন নিরুপায়। পুরনো ঘটনাগুলোকে মনে আনবার আর কোনো চেষ্টা না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখলাম, গোলকদের মধ্যে একটি বৃত্ত-ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। অতি দ্রুত রঙ-বদল হচ্ছে তার। সোনালী আভায় যেন সে ঝলমল করছে। সন্দেহ বদ্ধমূল হল এবার। বুঝতে আর বাকি রইল না যে, এ-বেচারী আমার উপর দারুণ চটেছে; আমার সঙ্গে যোগাযোগে ব্যর্থ হয়েই বোধ হয়।

কিন্তু আমি কী করবো? যা সাধ্যাতীত এবং অসম্ভব তা সম্ভব করব কী করে? অগত্যা সোনালী গোলকটির দিকে আবার তাকালাম। মনে হল, সহকর্মীদের কিছু নির্দেশ দিচ্ছে সে; ভবিষ্যৎ-কর্মপন্থার কথা বলছে।

ভবিষ্যৎ!—কথাটা মনে আসতেই সামনের অপরিচিতদের দ্বিগুণ রহস্যময় ঠেকল। নতুন কী ঘটে, তা নিয়ে জাগল দারুণ উৎকণ্ঠা। এদিকে ঘটছিলও কিছু না কিছু; সারাক্ষণই বলতে গেলে। সোনালীর নির্দেশে আমার উপর থেকে আলোকরশ্মি সংহরণ করে নিচ্ছিল গোলকরা। এবং ঠিক সংহরণের মুহূর্তে বলছিল,—ছিঃ ছিঃ! ভারী নীচমনা তুমি! বুদ্ধিসুদ্ধিহীন।

আমি এই কটূক্তির জবাব দিয়েছিলাম। চীৎকার করে বলে উঠেছিলাম,—না না; তোমরা যা ভাবছ, আমি তা নই। আমি এক উন্নত জগৎ থেকে আসছি। চিন্তায়, ভাবনায়, সব দিক দিয়ে উন্নত।

বৃথাই বলেছিলাম কথাগুলো। ওরা কেউ আমার কথা বুঝল না। মনে হল, ভাষা ওদের কাছে সেকেলে জিনিস। নিরুপায় হয়ে নিজেকে নিয়ে পড়লাম আবার। গবেষণা শুরু করলাম, কেন আমি এত চেষ্টার পরেও ব্যর্থ? নতুন জীবদের সঙ্গে চিন্তার যোগাযোগ কিছুতেই কেন গড়ে উঠল না?—একবার সন্দেহ হল, হয়তো বা আমি ওদের তুলনায় বিরাট বলে; মাটি থেকে আমার উচ্চতা এখনও চার-পাঁচশো ফুট বলে।……পরক্ষণেই আবার মনে এলো, না; এ কোনো যুক্তিই নয়। আমি ব্যর্থ আমার মস্তিষ্কের জন্যে; ঐ বুদ্ধিমান জীবদের তুলনায় তা বড় বেশি অনুন্নত বলে।

সেদিন কতক্ষণ ধরে আকাশ-পাতাল এসব ভেবেছিলাম, মনে নেই। তবে বুদ্ধিমান জীবদের কথা স্পষ্ট মনে আছে। ওরা চটপট আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। না, কোনোমতেই সময় নষ্ট করবে না ওরা। আমি যে দ্রুত সংকুচিত হচ্ছি এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে বিন্দুতে পরিণত হব তা ঐ বুদ্ধিমানরা আঁচ করেছিল। আমার আবির্ভাবের রহস্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ওরা ভেদ করতে চায়।

দেখতে দেখতে দুটো সারি বাঁধল ওরা। আমার দু'পাশে লম্বালম্বিভাবে দাঁড়াল। সকলের তলায় যে গোলক-দুটি তা'রা আমার অনেকখানি নীচে, মাটি থেকে খানিকটা মাত্র উঁচুতে! আর সবচেয়ে উপরের দুটি আমার কাঁধ-বরাবর প্রায়।

সার বেঁধে দাঁড়াবার খানিক বাদেই ওরা আবার আলোকরশ্মি ছড়াল। স্পষ্ট অনুভব করলাম, এবার গায়েও যেন খুদে খুদে সূঁচ ফুটছে; আর, গোলকরা নতুন কিছু করবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। হ্যাঁ, করল ওরা। কয়েক মুহূর্ত বাদেই। সবাই মিলে হঠাৎ আমাকে তুলে ধরল। যেন আমি কোনো পাখির পালক; আর ওরা খুব শক্তিশালী কিছু।

আশ্চর্য হলাম ওদের কৌশল দেখে। মনে হল, এত সহজে তুলে নিয়ে যাবার পেছনে নিশ্চয়ই উন্নত কোনো যন্ত্রশক্তি কাজ করছে! কেন না, তখনও আমি আমার বাহকদের তুলনায় বিরাট বড়।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি; দ্রুত। ঝড়ের বেগে। যেন শব্দের গতিকেও হার মানিয়ে। এগোতে কষ্ট নেই কিছু। শূন্যপথ ধরে চলছি। নিশ্চিন্তে। নিরুপদ্রবে। কিন্তু কোথায় যাবো আমি? কতদূর? আমার বাহক ঐ গোলকগুলোই বা কী? কেমন করে ওরা আমাকে আগলাচ্ছে?

## ॥ সাত ॥

ভাবছি কত কী। অচেনা গ্রহটির শূন্যপথ ধরে এগোচ্ছি। থেকে থেকে মেঘ গায়ে লাগছে। ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাকে। তা দিক— নিজেকে সান্ত্বনা দিই, এ এক দিকে বরং চেনাজানা দুনিয়ার মতো। এছাড়া, অন্য সব দিক দিয়েই তো এ-গ্রহ আলাদা। এখানে জীব আছে, কিন্তু গোলকের আড়ালে ওরা অদৃশ্য। বাতাস আছে, কিন্তু শব্দ নেই।

গোলকরা আমাকে বায়ুমণ্ডল ধরে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। বলেছি আগেই, শব্দের চেয়েও দ্রুতবেগে চলল। কিন্তু শব্দ কই চলার? ওরা তুফানের চেয়েও দ্রুতগামী, তা তো আমি নীচে মাটির দিকে তাকিয়ে বুঝছি। আশেপাশে মেঘ দেখে সব জানছি। ওদের চলন থেকে সরাসরি নয়। ওরা এত দ্রুত চলেছে, কিন্তু শব্দের ছিটেফোঁটাও ভেসে আসছে না। যা কিছু শব্দ আমি শুনছি, তার সবই আমার

নিজের। আমি বাতাস কেটে চলেছি, শুধুমাত্র সেই শব্দ কানে আসছে আমার।

কিন্তু কোথায় চলেছি? কত দূরে আরও?—অজানা আশঙ্কা আমাকে বিহ্বল করল; এবং ঠিক সেই মুহূর্তে দিগন্তের দিকে তাকাতেই আশ্চর্য এক দৃশ্য চোখে পড়ল আমার। স্পষ্ট দেখলাম, যেন একটা শহর। খুব কাছেই। তার এখানে-সেখানে স্তম্ভ আর গম্বুজ। বুঝতে চাইলাম, এ-কি সেই? খানিক আগে যাকে দেখেছি? পলক ফেলতেই যে অদৃশ্য হয়েছিল? কিন্তু না, ঠিক বোঝা গেল না কিছু। তার আগেই বিরাট এক শহরের কাছাকাছি এলাম!

শহরটির এক প্রান্তে সমুদ্র, নীল জল বুকে নিয়ে থৈ থৈ করছে; অন্য প্রান্তে পাহাড়, মেঘলোক ছিঁড়েফুঁড়ে বহুদূর উঠে গেছে। আমাকে সমুদ্রের তীরে নামান হল। যে গোলকগুলো এতক্ষণ ধরে আমায় বইছিল, তা'রা খুব সাবধানে নামিয়ে দিল আমায়। মাটির উপর খুব আলতোভাবে রাখল। এরপর গোলকরা আমার মাথার চারদিকে ঘুরতে লাগল। ঠিক আগের মতোই, বৃত্তাকারে।

দেখলাম, আলোকরশ্মি এগোচ্ছে আবার। আমার মস্তিষ্কের তন্তুগুলোতে যেন তোলপাড় শুরু হয়েছে। এবার নিজের খুশিমত ঘুরে বেড়াও,—আমার চেতনার গায়ে নতুন ভাবনা মুদ্রিত হল। এ-গ্রহের জীবরা নির্দেশ দিল আমায়,—বেড়াও; তবে একা নয়। আমাদের কয়েকজন তোমার সঙ্গে থাকবে। এ-শহরের কোনো কিছু যেন স্পর্শ করো না। করলে চরম শাস্তি।—কি জানো, তোমার চেহারাটা বিরাট, আমাদের কাছে অসুবিধের একটু। যখন আরও ছোট হবে, তখন তোমার মনকে নতুন করে জানার চেষ্টা করব! তবে আগের পদ্ধতিতে নয়; অন্যভাবে। আপাততঃ নিরুপায় আমরা। তোমার বিরাট মস্তিষ্ক আমাদের সব চেষ্টা বানচাল করে দিচ্ছে। তাই ঠিক হল, অপেক্ষা করব; প্রস্তুত হব। যেমন আগে হয়েছি, বছরের পর বছর ধরে।

ব্যস। আপাততঃ এই। এ-অবধি জানিয়েই বেশির ভাগ গোলক বিদায় নিল। মাত্র কয়েকটি থাকল আমার প্রহরায়।

স্পষ্ট দেখলাম, বিদায়ী গোলকরা শহরের দিকে এগোল। শহরের ঠিক মাঝামাঝি, বিরাট গম্বুজটির দিকে।

আমি খানিক আগে-পাওয়া গোলকদের নির্দেশ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করলাম। কিছুতেই ভেবে পেলাম না, ওরা কেন 'বছরের পর বছর ধরে' অপেক্ষা করেছে বললো।

যাক, সময় হলে জানা যাবে। আদৌ যদি কেনো সুযোগ আসে তো জানার প্রশ্ন উঠবে। এখন তো শহরের দিকে এগোই।—ভাবনার অবসরে নিজের মনের সঙ্গেই কথা বলে নিলাম একটু। খুব সাবধানে পা টিপে-টিপে শহরের দিকে এগোলাম।

না। গঠনশৈলীর দিক নিয়ে এ কিছু অসাধারণ নয়। তবে খুব সুন্দর দেখতে। বাড়িগুলো আমার তুলনায় চার-পাঁচ গুণ উঁচু। প্রতিটিরই চূড়ায় গম্বুজ। পথ-ঘাট নেই; বিভিন্ন বাড়ির মধ্যে সেতুপথও নেই। স্বয়ংসম্পূর্ণ সবাই। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বিরাট এক একটা বাঁক গড়ছে।

বাঁকগুলো ফুলের পাঁপড়ির মতো অনেকটা। পাশাপাশি, সামনে-পেছনে, প্রায় সমান আকারের। আর শহরটাও যেন ফুলেরই মতো। ঠিক গোলাকার কোনো ফুল। প্রস্ফুটিত। নানা রঙে বিচিত্রিত। তফাতের মধ্যে শুধুমাত্র এই যে, এখানে পাঁপড়িগুলোর মধ্যে ফাঁক আছে, জায়গা আছে যথেষ্ট।

অবশ্য না থাকলেও চলতো। এ-শহরে কাউকে মাটি-পথ ধরে হাঁটতে দেখি নি। এখানে সবাই শূন্যে ঘুরে বেড়ায়। মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে থাকে। যেন বায়ুমণ্ডলের বুকেই আসল আবাস ওদের; মাটিতে নয়।

কতজনকে দেখলাম, শূন্যপথ ধরে গেল। আমাকে দেখে হয়তো বা থমকে দাঁড়াল একটু। সকৌতুকে একটু দেখল।

ব্যস। এ-পর্যন্তই। এর বেশি আর কিছু করে নি ওরা। প্রহরী কয়েকজন ছাড়া কেউ আমার ধারেকাছে অবধি ঘেঁষে নি।

দিব্যি নিশ্চিন্তে আমি ঘুরে বেড়ালাম। শহর ধরে কখনও, আবার কখনও বা তার সীমানা ধরে, সমুদ্রের তীর-বরাবর।

কয়েক ঘণ্টা দেখতে দেখতে কেটে গেল। এবং তারপর প্রহরীদের একজন নির্দেশ দিল হঠাৎ,—চলো।

কোথায় যাবো?—আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় দেখি, প্রহরীরা এগোচ্ছে। যেন পথ দেখাচ্ছে আমায়।

এগোলাম। ওদের পিছু পিছু। শহরের মাঝ-মধ্যিখান বরাবর।

ওখানে ছিল এক বিরাট বাড়ি। তার গম্বুজটি অনেক দূর থেকে চোখে পড়ছিল। বাড়িটির মুখোমুখি হতে বুঝলাম, এ আসলে সভাকক্ষ; বহুজনের সম্মেলন-কেন্দ্র।

প্রহরীদের নির্দেশে এতে ঢুকলাম। না, ঢুকতে কোনো অসুবিধে হল না। কারণ, এর মধ্যে আরও অনেকটা সংকুচিত হয়েছি। আগের তুলনায় ছোট হয়েছি অনেক।

সভাকক্ষে ঢুকে দেখি, আসর জমজমাট। অগুনতি গোলক আগে থাকতেই হাজির। যেন আমি এখানে আসবো, সবাই তা জানতো।

আমাকে একটি মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। গোলকগুলো অর্ধবৃত্তাকারে আমায় ঘিরে রাখল। অবশ্য মঞ্চের উপরেও গোলক ছিল কয়েকটি। যেন প্রাজ্ঞজন, সাধারণের থেকে আলাদা।

মঞ্চের পেছনদিকে ছিল একটি পর্দা, বিরাট দেখতে। অনেকটা ডিম্বাকৃতি।

না, ঠিক কী দিয়ে যে পর্দাটি তৈরী, খেয়াল করিনি। কাচ হতে পারে, আবার অন্য কোনো পদার্থ হওয়াও বিচিত্র নয়।

—তাকাও ওদিকে। ওই পর্দার দিকে।—একটি গোলক আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে নির্দেশ দিল।

বলা বাহুল্য, এই নির্দেশও এসেছিল ঠিক আগের নির্দেশের কায়দায়, আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্‌বেজিত করে।

আমি নির্দেশ পালন করলাম; হুবহু। দেখলাম, যেন অদ্ভুত এক নীহারিকার ছবি ভেসে উঠছে পর্দায়। ঘুরতে ঘুরতে, ছুটতে ছুটতে তা যেন পর্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তের দিকে এগোচ্ছে।

—দেখছো তো। নীহারিকা! —আমার চিন্তার উপর কে যেন তার নিজের চিন্তা মুদ্রিত করে দিয়ে বললো,—এরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অংশ আমাদের এই পৃথিবী।

—দেখলে? —কে যেন তার চিন্তাকে আমার উপর চাপিয়ে দিল, —চলমান নীহারিকা, এইমাত্র যা তুমি দেখলে, শত শত বছর আগে তা আমাদের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন। হ্যাঁ, শক্তিশালী দূরবীন এবং ক্যামেরা ওঁদের ছিল। যা দেখেছেন, তার ছবি সযত্নে ওঁরা তুলে রেখেছেন। অবশ্য নীহারিকাকে এতটা জোরে ছুটতে ওঁরা দেখেন নি। ওঁদের অনেকের দেখা দৃশ্য একত্র জুড়ে গোটা জিনিসটাকে আমরা আরও গতিশীল করেছি; এবং তারপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পর্দায় মেলে ধরেছি সব কিছু।....কী? বুঝলে এবার?

না, কিছুই না, —চীৎকার করে জানাতে পারলে ভালো হ'ত। কিন্তু জানাবো কা'কে? এখানে কে বুঝবে আমার কথা? নিরুপায় হয়ে তাই আবার পর্দার দিকেই তাকালাম।

ওখানে নীহারিকা তখনও। ঘুরছে। ছুটছে: সাদা মেঘের জটাজাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যেন।

হঠাৎ দেখি, সাদার উপর বিরাট এক কালো ছায়া। আকাশ জুড়ে রাশিকৃত অন্ধকার। এবং নীহারিকার বেশ খানিকটা তার আড়ালে।

—এ আবার কোন্ কুহেলী? কিসের ছায়া এটা?—ভাবছি, এমন সময় দেখি, ছায়া ক্রমেই ছোট হচ্ছে। যেন বিশেষ একটা আকার নিচ্ছে। এবং তার সংস্পর্শে আসা-মাত্রই অসংখ্য নক্ষত্র ছিটকে পড়ছে এদিক-ওদিক।

—দেখছো? নীহারিকায় আলোড়ন,—আবার কে যেন তার নিজের চিন্তা আমার উপর চাপিয়ে দিল,—ঠিক এই রকমটি

হয়েছিল, আজ থেকে বহু বছর আগে। তবে একদিনে হয়নি; যুগ যুগ ধরে হয়েছে। যা তুমি দেখছো, তা দীর্ঘদিন ধরে দেখা অসংখ্য দৃশ্যের যোগফল। খুব তাড়াতাড়ি দেখানো হল ওদের, গতিবেগ দশ লক্ষ গুণ বাড়িয়ে দিয়ে।—অবশ্য আমাদের বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে খুব ভাবনায় পড়েছিলেন। ছায়াটা কী, নীহারিকায় আলোড়ন কেন, ওঁরা প্রথমে তা ঠিক ধরতে পারেননি। তাই সিদ্ধান্ত করেছিলেন নানারকম। শেষকালে অনেক চেষ্টায়, অনেক অনেক বছর পরে আসল ব্যাপারটা জানা গেল। কী ব্যাপার, বুঝলে?—পর্দায় এতক্ষণ ধরে তুমি নিজেকেই দেখেছ!—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি; আমাদের নীহারিকার দিকে যখন এগোচ্ছিলে।

এগোচ্ছিলাম? আমি?—হারানো কিছু ঘটনা মনে আনতে গিয়ে দেখি,—বটেই তো! পর্দায় তো আমারই ছবি। এগোচ্ছি। সংকুচিত হচ্ছি ক্রমেই। আমার অভ্যুদয়ে নক্ষত্ররা আলোড়িত। শেষকালে যখন আরও অনেকটা সংকুচিত হলাম, নক্ষত্ররা নিজ মহিমায় ভাস্বর তখন, নিজ নিজ সৌরজগৎকে নিয়ে জ্যোতির্ময়! আমি চার-সূর্যের অপরূপ জগৎটিতে প্রবেশ করলাম। এবং তারপর সাবধানে—অতি সাবধানে এগোলাম এই চতুর্দশ গ্রহটির দিকে। তারপর—

হঠাৎ দেখি, পর্দা ফাঁকা। ছবি-দেখানো বন্ধ। কে যেন তার চিন্তাকে আমার মধ্যে চালনা করছে,—কি জানো, বছরের পর বছর ধরে তোমার এই গতিবিধি আমরা দেখেছি। ক্রমে ছোট হচ্ছ তুমি, তাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কূলকিনারা কিছু পাইনি। তুমি কে? কোত্থেকে আসছো? কেন আসছো? আর কেনই বা ছোট হচ্ছ এভাবে, কিছুই বুঝতে পারিনি। যাক, এবার সব রহস্যের কিনারা হবে, আশা করি। অনুগ্রহ করে যদি আমাদের কথা শোন তো নিশ্চয়ই হবে। না না, বেশি কিছু করতে হবে না। শুধু চুপচাপ থাকবে। কিছু ভাববে না। যা ঘটে গেছে তা মনে আনার চেষ্টা করবে না। সবকিছু আমরাই খুঁজে নেবো; তোমার

মস্তিষ্কের স্তরে স্তরে অভিজ্ঞতার যে ছাপগুলো পড়েছে, প্রয়োজন-মাফিক তাদের জেনে নেবো।

বেশ, জানুক ওরা ;—ভাবলাম। এবং ঠিক পর-মুহূর্তেই সবরকম ভাবনা-চিন্তা থেকে ছুটি নিলাম সাধ্যমত। দেখতে দেখতে অদ্ভুত এক আলোকরশ্মি আমার দিকে ছুটে এল। মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোতে তোলপাড় শুরু হল যেন।

এমনটি আগেও হয়েছে। এ-গৃহে পা-দেবার খানিক বাদেই। কিন্তু এবার আগের তুলনায় আরও অনেক অস্বস্তি বোধ করলাম। যেন জোর করে কেউ আমাকে তন্দ্রার ঘোরে ঠেলে দিল।

অবশ্য ঠিক তন্দ্রাও নয়, ক্লান্ত ও অবসন্ন এক অবস্থা। দেখছি সব কিছু। সামনেই পর্দার গায়ে ছবি ভেসে উঠছে—অধ্যাপকের ঘর, ল্যাবরেটরী। আমি এলাম। বহু-পৃথিবীর অস্তিত্ব নিয়ে কথা হল। অধ্যাপক পারমাণবিক জগতের কথা বললেন। 'স্রিন্‌ক্‌স্‌'-এর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করলেন। আমি সন্দিগ্ধ। উড়িয়ে দিতে চাইলাম সবকিছু। কিন্তু অধ্যাপক ছাড়বেন না ; 'স্রিন্‌ক্‌স্‌' নিয়ে প্রথম-পরীক্ষা আমার উপরেই করবেন।—হ্যাঁ, করলেনও ; বিদ্যুৎ-বেগে ; আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ। চরম বিরক্তি আমার চোখেমুখে।

হ্যাঁ, খেয়াল নেই বলতে, গোলকগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিল এসব। এতক্ষণে পর্দার খুব কাছে এসে ওরা ভিড় করেছে। গোলকদের মধ্যে যে নাকি একটু বিশিষ্ট, আমার মুখোমুখি হয়ে অতীত অভিজ্ঞতাগুলোকে টেনে বের করছে, মনে হল, ছবি থেকে সবই যেন স্পষ্ট তার কাছে। এমনকি আমার এবং অধ্যাপকের কথোপকথন পর্যন্ত। ওদিকে আমি দেখে চলেছি, সংকুচিত হচ্ছি ক্রমেই। ছোট থেকে আরও ছোট। অধ্যাপক আমায় তুলে ধরে 'রেহীলিয়াম-এক্‌স্‌'-এর উপর রাখলেন। দেখতে দেখতে ধাতুখণ্ডটির গায়ে আমি অদৃশ্য হলাম। ক্রমে জীবাণুর দেখা মিলল। তারপর

মহাশূন্য ধরে ভেসে বেড়াবার দৃশ্য। এবং তারও অনেক পরে নীহারিকার দৃশ্য!

নীহারিকা আসতেই হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল পর্দা। কে যেন চিন্তা-সঞ্চালন করে আমায় জানিয়ে দিল,—ব্যস। বাকিটুকু জানি। আপাতত: 'স্রিন্‌ক্‌স্‌'-এর ব্যাপারটাই সবচেয়ে রহস্যময় ঠেকছে। আশ্চর্য আবিষ্কার! প্রয়োগ করলেই ছোট হতে থাকা। আশ্চর্য! যিনি আবিষ্কার করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি খুব উঁচুদরের বিজ্ঞানী। এবং এছাড়া, তোমার ভাগ্যও উঁচুদরের নিশ্চয়। কত কী দেখছ. দেখেছ. দেখবে। তোমায় ঈর্ষা করি। আবার দুঃখও হয় তোমার জন্যে। ভবিষ্যতে না জানি কী দেখ! ঘুরতে ঘুরতে কবে যে কোন জগতে গিয়ে হাজির হও! সবে তো শুরু; রহস্যময় তোমার এই জগৎ-পরিক্রমা। তবে হ্যাঁ, আমরা কৃতজ্ঞ। দারুণ কৃতজ্ঞ তোমার কাছে। ভাগ্যিস তুমি আমাদের গ্রহটিকে বেছে নিয়েছে। দয়া করে অবতরণ করেছ এখানে। কত কী জানলাম! এবং আরও হয়তো জানবো: তোমার সংকোচন যে থেমে নেই, চলেছে। অবিরাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই এত ছোট হবে তুমি যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া চোখেই পড়বে না। অবশ্য যন্ত্র আমাদের আছে। খুব শক্তিশালী যন্ত্র। পরমাণু-জগতের অনেক কিছু তা দিয়ে আমরা দেখতে পাই। এবং বলা বাহুল্য, তোমার বেলায়ও দেখবো। কিন্তু প্রশ্ন, কতদূর অবধি? খানিকবাদেই আর কি তোমার নাগাল পাবো? এমনকি অতি বড় অণুবীক্ষণ দিয়েও?

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম বোধ করি। চিন্তা-চালাচালিতে আর ঐ পরিচিত দৃশ্যগুলো দেখে হয়তো বা অভিভূতও। অবিরাম যে সংকুচিত হচ্ছি, এতক্ষণ তা খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখি, গোলকগুলো আমার তুলনায় অনেক বড়। সভাকক্ষ, যেখানে আমি এসেছি, তার ছাদ বিরাট উঁচুতে।

এবার আর চুপচাপ থাকা গেল না। গোলকগুলোকে ডাক করে ভাবনার প্রশ্নবান ছুঁড়লাম,—ছাখ, তোমরা বললে বটে, আমাকে

ঈর্ষা কর। আবার আমার জন্যে নাকি দুঃখও হয়। কিন্তু কেন বলো তো? একই সঙ্গে দুঃখ এবং ঈর্ষা? একটু আগে এর যে ব্যাখ্যা দিলে, কেনই বা তা এত সংক্ষিপ্ত?

—কেন আবার! সঙ্গত কারণেই,—জবাব এল অপর দিক থেকে। স্পষ্ট জবাব। হয়তো বা ছোট হয়েছি বলেই ভাবনার আদানপ্রদানে এখন আর কোনো অসুবিধে হল না। মনে হল, ওদের একজন জানাচ্ছে,—তোমাকে ঈর্ষা করি, কারণ, যে অভিজ্ঞতা তুমি সঞ্চয় করবে, বিশ্বজগতে কোনদিন কি তা কেউ করেছে? তোমার জন্যে দুঃখ হয়;—না, থাক; কারণটা না-ই বা আর খোলসা করলাম। নতুন নতুন জগৎ-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তুমি তা একদিন নিজেই আবিষ্কার করবে! আপাততঃ যা শুনলে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।

কিন্তু বললেই কি থাকা যায়? তখন হাজার প্রশ্ন আমার মনে, অদ্ভুত এই জীবদের সম্পর্কে আকাশ-ছোঁয়া কৌতূহল। প্রতি মুহূর্তে কত কী জানবার ইচ্ছে। শেষ অবধি ইচ্ছেকে ভাবনায় রূপ দিলাম—

—দ্যাখ, হালচাল দেখে তো মনে হচ্ছে, তোমরা বায়বীয়। অথচ অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কথা বললে। এদের নিয়ে কী করে কাজ কর? তাকাও কেমন করে?

—তাকাবার কথা বলছো?—জবাব আসে অপর দিক থেকে,—তোমাদের মতো বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকাই না। গোটা দেহকেই দরকার মতো কাজে লাগাই।

—আমার দেহটা নিশ্চয় অদ্ভুত ঠেকছে তোমাদের?

—হ্যাঁ, তা ঠেকছে।

—কেন, তা জানি।

—কেন বলো তো?

—এ যে কঠিন, তোমাদের মতো বায়বীয় নয়।

—ঠিক। ঠিক ধরেছ। আসলে কী জানো, দেহ এবং ইন্দ্রিয়

সম্পর্কে তোমাদের ধারণার সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। তুমি যে ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখ, নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, তা হারানো মানে সর্বনাশ। কিন্তু আমাদের সর্বনাশ এত সহজে হয় না। দেহটাই ভিন্নভাবে তৈরি যে! সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের পদার্থ দিয়ে।

—কী দিয়ে তৈরী তোমাদের দেহ, বলবে?

—বলতুম, সময় পেলে। আপাততঃ এইটুকু শুধু জেনে রাখো, তোমাদের দেহে অনেক কিছুই অপ্রয়োজনীয়। আমাদের কোনো-কালে এসব বালাই ছিল না। দেহকে শূন্যে মেলে ধরে যেদিকে খুশি চলি আমরা; নিজের ভারে নিজে অযথা ক্লান্ত হই না।

—বলো কী? ক্লান্তি নেই তোমাদের?

—থাকবে না কেন, আছে। তবে তা সহজে আসে না। দেখো, তোমাদেরও ঠিক এইরকম হবে একদিন। ক্রম-বিবর্তনের পথ ধরে যখন আরও এগোবে, তখন।

—তোমরা তো দেখছি, অনেকদূর এগিয়েছ।

—হ্যাঁ, তা এগিয়েছি আমাদের সমাজব্যবস্থা খুবই উন্নত; জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরম শক্তিশালী। তোমার আবির্ভাবের খবর পেয়ে বিজ্ঞানীরা এখানে ছুটে আসেন। এই শহরটিতে এসে জড়ো হন। অবশ্য শহর যা তুমি দেখলে, আমাদের হিসেবে তা বড় কিছু নয়। এর চেয়েও অনেক বড় শহর আমাদের আছে। এখানে সবাই এসেছেন, তোমাকে জানবেন বলে।

—আমায় দেখে ভয় পাও নি তোমরা? আতঙ্কিত হও নি?

—না না, ঠিক ভয় বা আতঙ্ক নয়, অবাক হয়েছি। ঠিক বুঝতে পারি নি। কেন তুমি এখানে আসছ, তা' ভেবে সন্দিগ্ধ হয়েছি। কারণ, অবিরাম সংকোচনের ব্যাপারটা ধরতে পারি নি। তাই সাবধান হয়েছি গোড়া থেকেই। প্রথমে দু'জন মাত্র প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে তোমার হালচাল লক্ষ্য করেছি।

—ওরা কা'রা? ওই প্রতিনিধিরা?

এবার আর জবাব মিলল না। এত ছোট হয়েছি যে চিন্তার সব-

রকম যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আর আমি মনে মনে বললাম,—বিদায়! নতুন পৃথিবী, বিদায়।

## ॥ আট ॥

'শ্রিন্‌ক্‌স্'-এর দৌলতে দ্রুত সংকুচিত হচ্ছি। ছোট, আরও ছোট হচ্ছি ক্রমেই,—আমার আশেপাশের উন্নত জীবরা তা লক্ষ্য করে থাকবে। কেননা, আমাকে খুব সাবধানে উঠিয়ে নিল ওরা। যত্ন করে নিয়ে গিয়ে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রাখল।

বেশিক্ষণ পেরোয় নি, এমনকি এক ঘণ্টাও নয়; দেখলাম, আবার সেই পুরনো খেলা!—যে বস্তুটির উপর আমি দাঁড়িয়ে, তা যেন ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে; আমার তুলনায় বিরাট ও বিপুল হচ্ছে ক্রমেই।

আরও খানিকক্ষণ বাদে বোঝা গেল, বস্তুটি আসলে নীরেট নয়, ফাঁপা। তার জায়গায় জায়গায় বিশাল শূন্যতা। দূরে—বহু দূরে-দূরে দল-বাঁধা নক্ষত্র—নীহারিকা।

আমি নীহারিকাদের একটিকে বেছে নিলাম। মনে হল, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আমার চারপাশে; ঘুরছে, ছুটছে, হাতছানি দিচ্ছে।

চিন্তায় পড়লাম, কোথায় যাই?

শেষ অবধি অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল একটি নক্ষত্রকে বেছে নিলাম। গাঢ় হলদে আভা তা থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছিল।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চতুর্থ গ্রহটিতে নামতে লাগলাম। না না, ভুল। নামছিলাম আসলে ইলেকট্রন-এ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায়, এক টুকরো কাচের উপর কোটি-কোটি, কোটি-কোটি ইলেকট্রনের মধ্যে একটিতে।

ইলেকট্রনরা কোথায় আছে?—না, একখণ্ড রেহীলিয়াম্ এক্‌স্-এর মধ্যে; ল্যাবরেটরীর টেবিলের উপর।

ভাবতে গিয়ে পুরনো কথা মনে এল।—অধ্যাপক হয়তো বা ল্যাবরেটরীতে এখন। রেহীলিয়াম্ এক্‌স্-এর একেবারে সামনে।

আশ্চর্য! আমার এত কাছে তিনি! আবার এত দূরে! আমি এখন কোথায় কোন্ রহস্যপুরীতে নামছি, কে জানে!

দেখতে দেখতে গ্রহটির আরও কাছে এলাম। বায়ুমণ্ডলে ঢুকছি, ঠাওর হল।

না, এ-গ্রহের আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। চারিদিক স্বচ্ছ, পরিষ্কার। অনেক দূর থেকেই গ্রহটির পৃষ্ঠদেশ নজরে পড়ছে—নীল, সবুজ আর ফিকে-হলুদের বাহার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বার বার।

বায়ুমণ্ডলে ঢুকতে সব কিছু আরও স্পষ্ট হল। সবুজ বনে ঢাকা খাড়া পাহাড়গুলো রীতিমত বিপজ্জনক ঠেকল। পাহাড়ের একপাশে নীল সমুদ্র, বহুদূর অবধি; অন্যপাশে ঢেউ-খেলানো রুক্ষ প্রান্তর; ঠিক ফিকে-হলুদ নয়, বেশ গাঢ় কোথাও কোথাও। আমার ঠিক পায়ের কাছে এক হলুদ-বরণ নদী, সামনেই এক মালভূমির উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে।

মালভূমিটি ঘন জঙ্গলে ঢাকা। আমার আশেপাশেও জঙ্গল শুধুই; এমনকি খাড়া পাহাড়গুলোর চূড়া অবধি। অথচ আশ্চর্য! একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। বাতাস নেই এতটুকু। এদিকে আমি যেখানটায় দাঁড়িয়েছি, সেখানকার প্রায় আধ মাইল অবধি জায়গা দলিত। গাছপালা সব ভেঙেচুরে একশেষ।

বুঝতে কষ্ট হল না, আমার বিরাট আকৃতি যত নষ্টের গোড়া। পায়ের চাপে না জানি কী বিরাট সর্বনাশ করেছি!

অগত্যা চুপচাপ দাঁড়ালাম; হাঁটাহাঁটি তো দূরের কথা, নড়াচড়া পর্যন্ত বন্ধ করে। গ্রহটিতে আদৌ কোনো জীবজন্তু আছে কিনা, খুঁজতে লাগলাম।

না, গাছপালাকে বাদ দিলে জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও। খাড়া পর্বত, প্রশস্ত মালভূমি, ঢেউ-খেলানো প্রান্তর—সবই খাঁ খাঁ করছে।

পর্বতগুলোর দিকে ভালো করে তাকালাম আবার—

গুহা চোখে পড়ল, অনেকেরই গায়ে গায়ে।

হঠাৎ মাঝারি আকারের এক গুহার দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ আমি। দেখলাম, কী যেন নড়ছে। গুটি গুটি বেরিয়ে আসছে গুহা থেকে।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল, জীব একটা, অদ্ভুত-দর্শন ; গুহা থেকে বেরিয়েই আমার দিকে তাকাল। একদৃষ্টিতে।

আমি দমবার পাত্র নই। জীবটিকে দেখতে লাগলাম।

মোট চারটি পা ছিল ওর। দেহটি ছিল রোমশ। চার পায়ের ওপর ভর দিয়ে ও এগোচ্ছিল। আমার গতিবিধি খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে ও ফিরে গেল। পর্বতেই আবার আশ্রয় নিল যেন।

এদিকে অন্যান্য গুহাতেও চাঞ্চল্য তখন। আস্তানার আঁধার ছিঁড়েফুঁড়ে ঠিক একই রকমের জীব আলোয় বেরোচ্ছে। আমায় দেখে নিয়ে যথাস্থানে ফিরছে আবার।

আমি অবাক। তবে ভীত নই মোটে। ধৈর্য ধরে দেখছি, ওরা কী করে।

শেষ অবধি দল বেঁধে বেরোল ওরা। গুহার বাইরে এসে একজোট হয়ে দাঁড়াল। যেন সবাই খুব উদ্বিগ্ন। আমার আবির্ভাবে ভীত, সন্ত্রস্ত।

আমি ওদের তুলনায় বিরাট বড় তখনও। ওরা আমার কাছ থেকে মাইল দু'য়েক দূরে, অথচ মনে হচ্ছিল, পা বাড়ালেই ওদের নাগাল পাবো।

ভাবলাম, বেশ তো ; দেখাই যাক না, কী হয়। পা বাড়াচ্ছি, এগোচ্ছি ওদের দিকে, এইরকমএকটা ভাব করি ; ওদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি একটু।

তাই করলাম। ওরা আমাকে এগোতে দেখে বিদ্যুৎবেগে পিছিয়ে গেল। কাছেই এক গিরিখাতে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে কী সব যেন বলাবলি করতে লাগল।

শুধুমাত্র একজনই ব্যতিক্রম। দলের সবাইকে ছেড়ে একা এগোল। দিব্যি তীর ছুঁড়ল আমাকে তাক করে।

আমি এসব আমলই দিই নি। কেননা, বেশ জানতাম, তীর গায়ে লাগবে না। অস্ত্রটি যেমন সেকেলে, তেমনি ছোট। এবং এছাড়া, তীরন্দাজটিও অনেক দূরে আমার থেকে।

আসলে হলও তাই। তীরটি খানিকদূর এসেই জঙ্গলের উপর আছড়ে পড়ল।

আমি প্রতিবাদ করিনি। চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক আগের মতোই।

হঠাৎ দেখি, ওই বর্বর জীবগুলোর জটলা থেকে মাতব্বর গোছের কে একজন বেরিয়ে এল। যে তীর ছুঁড়েছিল তার কাছে এসে বললো কী যেন।

কী বললো? কী বলা সম্ভব?—ভাবছি, এমন সময় দেখি, আরও কয়েকজন তীরন্দাজটির দিকে এগোচ্ছে। ঘিরে ধরছে ওকে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে গিরিখাতের দিকে নিয়ে যেতে। যেন ভাবখানা এই যে, কাজটা তুমি ভালো করো নি। দলছুট হয়ে এতদূর এগিয়ে আসা ঠিক হয়নি। দেখছ না, সামনেই দানব। ভয়াল, ভয়ঙ্কর! ওর সঙ্গে কি একা লড়তে আছে?

তীরন্দাজটিকে নিয়ে সবাই গিরিখাতের দিকে এগোল এবং তারপর—

বেশ খানিকক্ষণ ধরে সলা-পরামর্শ চলল বোধ করি। হ্যাঁ, আমাকে নিয়েই পরামর্শ। তখন ওদের সকলেরই হাতে তীর-ধনুক।

কিছুটা এগিয়ে সবাই একসাথে আক্রমণ শুরু করল। আমাকে তাক করে তীর ছুঁড়ল একের পর এক।—না, কোনো তীরই লাগেনি। কিছুদূর অবধি এসে ঠিক আগেরটির মতোই জঙ্গলে পড়েছিল।

অবশ্য গায়ে পড়লেও কিছু হত না। এত খুদে খুদে ওরা যে কোনো কিছুই টের পেতাম না হয়তো।

কিন্তু এ তো গেল একতরফের কথা। অন্যতরফ, মানে জীব-

গুলো? কিছুই কি বুঝছে না? তীরগুলো যে অযথা নষ্ট হচ্ছে, শত্রুর গায়ে আদৌ লাগছে না, তা বোঝবার মতো বুদ্ধিও কি ওদের নেই?

ভাবছিলাম আকাশ-পাতাল। এমন সময় দেখি, ওরা এগোচ্ছে। না, ঠিক আমার দিকে নয়, ঢালু পথ ধরে নীচের এক উপত্যকার দিকে।

ওখানে কিসের যেন সোরগোল। জঙ্গলকে ঘিরে যেন আরও একদল বর্বর।

ব্যাপার কী?—ভালো করে তাকাতেই চোখে পড়ল, প্রথম দলের কয়েকজন একটা খাদের মুখোমুখি। ইশারায় নীচের ওদের কী যেন বলছে।

একবার মনে হল, হয়তো বা আমার সম্পর্কে কিছু। যাতে নীচের ওরা সাবধান হয়, আমাকে এড়িয়ে ভিন্ন পথ ধরে গুহায় ফেরে, এমন কিছু।

কিন্তু আমি তো কা'রও ক্ষতি করিনি। পায়ের চাপে গাছ-পালা নষ্ট হবে ভেবে এমনকি বেশি নড়াচড়া পর্যন্ত করিনি। আমাকেও ভয়?

আশঙ্কা হল, ভয় হয়তো আমার বিরাট আকৃতিকে ঘিরে।—ফেরবার পথে উপত্যকার ঐ জীবগুলো যদি অসতর্ক হয়, যদি ভুল করে আমার দিকে এগিয়ে আসে এবং আমি যদি মাড়িয়ে দিই ওদের!

দেখলাম, ইশারায় কাজ হল। নীচের ওরা সাড়া দিল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু সোরগোল কিছু কমল না।

আসলে কী হচ্ছে ওখানে? শিকার?

এবার একটু ঝুঁকে পড়ে তাকালাম। এবং এতেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

দেখলাম, হ্যাঁ, শিকারই বটে। নীচের ওরা সশস্ত্র।

তীর-ধনুক হাতে নিয়ে কেউ। আবার কেউ বা পাথর হাতে।

বিরাট এক জানোয়ারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আক্রমণ করছে চারিদিক থেকে।

ওদের সাহসের তারিফ করতে হয়। কেননা, যে জীবটাকে ওরা শিকার করছে, তা ওদের তুলনায় কম করে বিশ গুণ বড়। এবং এছাড়া, যেমন ভয়ালদর্শন তেমনি অদ্ভুত।

প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা ছিল সেটা। চওড়া প্রায় পনের ফুট। মোট আটটি পায়ের উপর ভর দিয়ে শিকারীদের দিকে এক একবার সে তেড়ে যাচ্ছিল।

শিকারীরা ওস্তাদ। মুহূর্তের মধ্যে সরিয়ে নিচ্ছিল নিজেদের। পরক্ষণেই আবার ঝোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে দিব্যি তীর ছুঁড়ছিল।

জন্তুটা দেখলাম, মরিয়া। কয়েকটা তীর গায়ে বেঁধা সত্ত্বেও লড়াই চালাচ্ছে; দেহের নানা জায়গা থেকে বেরিয়ে-আসা শুঁড়-গুলোকে শূন্যে দুলিয়ে দিয়ে।

একবার শুঁড়ের দৌলতেই প্রতিশোধ নিল ও। শিকারীদের একজনকে জড়িয়ে ধরল।

বেচারী মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হয়ে থাকবে। উপরের বন্ধুদের ইশারাকে অনুসরণ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে হয়তো।

ভাবলাম, কিছু একটা করা দরকার। এখুনি। এই মুহূর্তে।

করলামও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। হাত বাড়িয়ে জন্তুটাকে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলাম।

হঠাৎ আক্রমণ। অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত। জন্তুটার তুলনায় অনেক বড় আর অনেক শক্তিশালী কারও কাছ থেকে। তাই কিছুই সে করতে পারেনি। বেকায়দায় পড়ে শিকারটিকে বরং ছেড়ে দিয়েছিল। এবং অনুমান করি, শিকারও প্রাণে বেঁচেছিল সে-যাত্রা।

দেখলাম, এই সুযোগ। বিদ্ঘুটে এই জন্তুটাকে নিকেশ করি। গুহাবাসী বর্বরগুলো খুশী হবে। ওদের শত্রু বধ করেছি দেখে আমাকে হয়তো বা মিত্র ভাববে।

শেষ অবধি তাই করলাম। জন্তুটাকে মাটির উপর রেখে

চেপে দিলাম। যেন কোনো পোকা, বহুগুণ শক্তিশালী শত্রুর কবলে।

জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে নিথর হয়ে গেল। কালচে মতো কিছু তরল পদার্থ গড়িয়ে এল ওর দেহ থেকে। আর শিকারীরা দেখলাম, ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সব দেখছে।

একটু বাদেই আত্মস্থ হল ওরা। হয়তো বা ভাবল, সামনের ওই অদ্ভুত জীবটি শুধুমাত্র শক্তিশালীই নয়, আমাদের বন্ধুও বটে। কেননা এবার দেখা গেল, ধীরে ধীরে ওরা এগোচ্ছে ; জন্তুটা যেখানে পড়েছিল, সেদিকে।

কাছাকাছি হতেই সলা-পরামর্শ করল ওরা। বোধ করি, শিকারকে নিয়ে পরামর্শ, কী করে ওকে গুহায় নেয়া যায়, তা নিয়ে।

তবে অন্য কিছু পরামর্শও হয়ে থাকবে। কারণ, একটু বাদেই দেখলাম, জীবগুলো সব উবুড় হয়ে শুয়ে। যেন শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করছে আমায়।

আমি কী আর করি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখতে লাগলাম। মনে হল, জীবগুলো আমাকে দৈত্য, দানব বা দেবতা গোছের কিছু ভাবছে।

এদিকে খানিক বাদেই আবার চলল ওদের সলা-পরামর্শ। নিহত জন্তুটিকে ঘিরে সবাই আবার অদ্ভুত সব অঙ্গভঙ্গী করল।

ভাবলাম, না, আর দেরী নয়, ওদের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝে নেওয়া দরকার।

কিন্তু কী করে বুঝবো! অনেক জল্পনার পরেও যখন সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসা গেল না, তখন কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই এক কাজ করে বসলাম।

জীবগুলোর একটিকে ধরলাম মুঠি করে। আলতোভাবেই ধরলাম। চোখের খুব কাছাকাছি এনে ইঙ্গিতে শুধালাম,—কী চাও তোমরা? জন্তুটাকে গুহায় নিয়ে যেতে?

সামান্য এইটুকু বোঝাতে বারকয়েক হাত নাড়লাম আমি। গুহা-

গুলোকে দেখিয়ে বারবার করে জীবটির দৃষ্টি-আকর্ষণের চেষ্টা করলাম।

কিন্তু না, বৃথা চেষ্টা। সে মোটে তাকালই না। আগাগোড়া চোখ বুজে থাকল এমনভাবে যেন মরতে বসেছে। সামনেই ঘাতক। তাকালে বিভীষিকা দেখবে।

অবশ্য না তাকিয়েও বিভীষিকা নিশ্চয় দেখছিল। কেননা, অনুভব করলাম, থর-থর করে সে কাঁপছে।

বেচারা! তাড়াতাড়ি ওকে যথাস্থানে নামিয়ে দিলাম। আমার সৎ উদ্দেশ্যটা অন্যদের বোঝাতে চাইলাম এবার।

কিন্তু না, কেউ বুঝতে চাওয়া তো দূরের কথা, আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত। সবাই দেখা গেল, সন্ত্রস্ত। ভীষণরকম। যে জীবটি ছাড়া পেয়েছে, তাকে ঘিরে জটলায় ব্যস্ত।

ওরা হাজার রকম প্রশ্ন করছিল বোধ করি। জীবটির নতুন অভিজ্ঞতা, মৃত্যুর মুখ থেকে অল্পের জন্য ফিরে আসা, আমার হালচাল ইত্যাদি নিশ্চয় ওরা জানতে চাইছিল।

আমি যুগ যুগ ধরে, এমনকি আজ থেকে হাজার বছর পরেও ওদের কাছে বিস্ময়ই থাকবো। আমার আবির্ভাব নিশ্চয় একটা দৈব ঘটনা বলে গণ্য হবে; এবং বংশানুবংশ-পরম্পরায় এ গ্রহের জীবরা ঘটনাটির কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে না।

অবশ্য আমিই কি খুঁজে পেলাম? সভ্যতার সোপানে কত লক্ষ শতাব্দী ওরা পিছিয়ে, তা কি জানলাম?

না, কিছুই জানি নি! তার আগেই সংকুচিত হচ্ছিলাম দ্রুত। ওদের এড়িয়ে দুর্গম একটা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলাম।

জায়গাটা ছিল এক খাড়া পাহাড়ের গায়ে। চূড়ার খুব কাছাকাছি।

ওখানে আশ্রয় নেবার কারণ, এলাকাটা নিরিবিলি। পাহাড় বেয়ে এতটা উঁচুতে কেউ উঠবে না। আমার ছোট হবার সুযোগ নিয়ে সহজে আক্রমণ করবে না কেউ।

কিন্তু শেষ অবধি যা ভাবিনি, তাই হল। যা ঘটল, বলতে কী তা প্রায় সরাসরি আক্রমণেরই মতো।

সন্ধ্যে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে তখন। বন-পাহাড় ঘন আঁধারে আচ্ছন্ন। চাঁদ নেই গ্রহটিতে। আশেপাশে আলোরও কোন চিহ্ন নেই। দূরের আকাশে শুধুমাত্র কয়েকটা নক্ষত্র মিট-মিট করছে। আমার উচ্চতা এসে ঠেকেছে বড় জোর চার কি পাঁচ ইঞ্চিতে।

চুপচাপ বসে আছি। বিরাট এক পাথরের আড়ালে। দূর-দূরান্তর থেকে অদ্ভুত সব আর্তনাদ ভেসে আসছে।

হঠাৎ মনে হল, ঝড়ো হাওয়া ; যেন আমারই দিকে এগোচ্ছে ; আশেপাশের বনপাহাড়কে কাঁপিয়ে দিয়ে।

অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঝড়ো হাওয়া দেখতে দেখতে আরও কাছে এগিয়ে এল! একবার মনে হল, কালো-মতো একটা চাঁদোয়া যেন ; আকাশের অনেকখানি ঢেকে ফেলেছে। পরক্ষণেই সন্দেহ হল আবার, আকাশচারী কোন দানব নয়তো ? উড়তে উড়তে এদিকেই আসছে ?

দেখলাম, দুই-ই সত্যি। যা আসছিল তা সত্যি একটা আকাশচারী দানব। তার ডানা দুটোকে চাঁদোয়া ভেবেছি এতক্ষণ।

আঁৎকে উঠলাম। দারুণভাবে। স্পষ্ট অনুভব করলাম, ঝড়ো হাওয়াটা বন্ধ হল হঠাৎ। ধারেকাছেই ঝুপ করে কী যেন পড়ল।

কী পড়ল ? কে এখানে ? কে ? কে ?—ইচ্ছে হল, চিৎকার করে ডাকি।

কিন্তু না, কিছুই করলাম না, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া।

এদিকে ঠিক আমার সামনেই কী যেন চকচক করছে। সূর্যের কিরণ-লাগা তুষারাচ্ছন্ন শিখরের মতন।

সাহসে ভর করে এগোলাম। চকচকে বস্তুটার গায়ে হাত ঠেকালাম একটু। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, মহাপ্রলয়,—আকাশচারী উড়তে শুরু করল আবার ; চকচকে বস্তুটা যে ওর

নখর, তা জানান দিয়ে। কেননা স্পষ্ট দেখলাম, ওর থাবার তলায় ঐরকম আরও অনেকগুলো মারণাস্ত্র চকচক করছে।

আকাশচারীটি আসলে পাখি,—রাক্ষুসে, অতিকায়। পাহাড়-চূড়ায় নেমেছিল। এখন আবার অন্য কোথাও গেল। কিন্তু ঠিক কোথায় যে গেল, কোন্ মুল্লুকে, তা জানি না। কারণ, আশেপাশের পাহাড়গুলো চারিদিক থেকে তখন আমায় ঘিরে রেখেছে। ঠিক মাথার উপরকার আকাশটুকু ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

বোঝা গেল, আরও ছোট হয়েছি এর মধ্যে। এ-গ্রহটির সঙ্গে সম্পর্কও এবার ছিন্ন হবে।

॥ নয় ॥

আসলে হলও তাই। খানিকক্ষণের মধ্যেই এত ছোট হলাম যে এক কণা বালির সঙ্গে আমার আর কোনো তফাৎ রইল না।

হ্যাঁ, তখন বালির উপরেই দাঁড়িয়ে। স্পষ্ট দেখছিলাম, আশে-পাশে একটু বড় কণাগুলো আমাকে ছাড়িয়ে অনেকদূর অবধি উঠে গেছে।

দেখতে দেখতে আরও বড় মনে হল ওদের। যেন ওরা আকাশছোঁয়া। সবচেয়ে উঁচু পর্বতের চেয়েও উঁচু!

কয়েক মিনিট এইরকম কাটল। এবং ঠিক এর পরেই আসল পরিবর্তনটা টের পেলাম!—আমার তৃতীয় দফা পরিবর্তন, অর্থাৎ, সংকুচিত হতে হতে আবার পরমাণুর জগতে অভিযান। ছায়াপথ ও নীহারিকা-ভরা আর-এক বিশ্বজগতের মুখোমুখি আবার।

'শ্রিন্‌ক্‌স্'-এর দৌলতে যত সংকুচিত হলাম, ক্ষুদ্র হলাম, নক্ষত্রের জটলাগুলোর দূরত্বও তত বাড়তে লাগল।

অবশেষে অদ্ভুত ও বিচিত্র সব সৌরজগৎ চোখে পড়ল আমার। মনে হল, একসঙ্গে অনেকেই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

পছন্দমত একটি সূর্যকে বেছে নিলাম। আরও একটু সংকুচিত

হলে ওর সবচেয়ে দূরের গ্রহটিতে নামব, ঠিক করলাম। কিন্তু নামবো কী, তার আগেই বিপদ।

গ্রহটির দিকে এগোচ্ছি, বারবার ভাবছি, ছোট হই আরও, গ্রহটির তুলনায় আরও অনেক ছোট, তারপর ওতে নামা যাবে, এমন সময় দেখি, গ্রহবাসীরাই যেন এগোচ্ছে। আমার উপর নামতে চাইছে।

হ্যাঁ, সত্যি নামল ওরা। এগোল ঠিক যেন আলোর গতিতে। মহাকাশযান ছিল ওদের। ঐ যানে করেই ওরা এল, সামনে যে সৌরজগৎটি ছিল তার কোনো গ্রহ থেকে।

মহাকাশযানটিকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন কেউ সবেগে ছুঁড়ে দিয়েছে, আমাকেই তাক করে যেন।

আমি তখন আতঙ্কে-বিস্ময়ে স্তব্ধ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। দেখছি, অদ্ভুত এক রূপালী আভা ছিটকে বেরোচ্ছে ঐখান থেকে। ধোঁয়া আর আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে ওটা আসছে।

খানিক বাদে। খুব কাছে এল। একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করেই ওটা নামল আমার উপর।

না, আমি কোনো অস্বস্তি বোধ করিনি। কিছু অসুবিধেও নয়। ভেবেছি, বুকের উপর ছোট্ট কোনো পোকা বসল।

মিনিট কয়েক পর। দেখি যে, কা'রা যেন যানটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। সোনালী কয়েকটি বিন্দু যেন। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল ওদের। ঝলমলে, অপরূপ। ওরা বেরিয়ে এসে ডানার মতো কী যেন মেলে ধরল। উড়তে শুরু করল দিব্যি।

ডানাগুলো ওদের তুলনায় অনেক বড়। পনের-বিশ গুণ তো হবেই, বেশিও হতে পারে। ডানার রঙ্ মহাকাশচারীদের মতোই সোনালী।

কিন্তু কী চায় ওই সোনালী জীবগুলো? আমাকে জানতে?— নিজের মনকেই প্রশ্ন করি সেদিন। বারবার ভাবি,—কে জানে,

হয়তো বা জানবে বলেই এতদূর ছুটে এসেছে ওরা। আমাকে ওরা নতুন কোনো জগৎ ভেবেছে। কিন্তু তা-ই বা কী করে সম্ভব? জগৎ গোলাকার হবে দেখতে, আমার মতো লম্বাটে তো নয়! এই সোনালী জীবগুলো—হাবভাব দেখে যাদের খুব বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে, তা'রা কি এই সহজ সত্যটিও জানে না?

দেখা যাক, শেষ অবধি কী দাঁড়ায়, নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম একবার। অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম, সোনালী জীবগুলো আমার খুব ধারেকাছেই। ওরা তখন এত কাছে যে ইচ্ছে করলেই যা খুশি করতে পারি। সবাইকে হাতের মুঠোর মধ্যে বন্দী করে এমনকি নতুন কোনো সৌরজগতে ছুঁড়ে দেয়াও কিছু অসম্ভব ছিল না।

ওরা কেবলই পর্যবেক্ষণ করল আমায়। বিভিন্ন কোণ থেকে যেন কত কী পরীক্ষা চালাল। আমি ভাবলাম, আশেপাশেই হালকা বায়ুমণ্ডল আছে নিশ্চয়। তা না হলে ওদের পক্ষে এমন সুন্দরভাবে উড়ে বেড়ানো সম্ভব হত না।

আর ভাবলাম, হাত-পা নাড়ি একটু। আমি যে আসলে জীব, নতুন কোনো জগৎ বা পৃথিবী নই, তা ওদের বুঝিয়ে দি। কিন্তু না, নেড়েও তেমন কিছু ফল হল না। ওরা আমার কাছ থেকে খানিকটা সরে গেল শুধু। আবার প্রদক্ষিণ শুরু করল নতুন উদ্যমে। এবার আমি চুপচাপ। এই আশায় যে, ওরা হয়তো কাছে আসবে আমার, দেহের কোথাও না কোথাও বসবে, আর আমি ভালো করে ওদের দেখবার সুযোগ পাবো।

কিন্তু না, সে সুযোগ আর পেলাম না। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বিদ্যুৎবেগে ওরা মহাকাশযানটিতে ঢুকল। এবং ঠিক পর-মুহূর্তেই ধোঁয়া আর আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে ফিরে চলল আবার। ওদের গতিবিধি দেখে এখন আর সন্দেহ রইল না যে খুবই উন্নত জীব ওরা। এসেছিল অগ্রবর্তী দল হিসেবে; আমার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে নিজেদের গ্রহে ফিরবে।

কিন্তু ফিরে গিয়ে? কী বলবে ওরা? রাক্ষুসে ও ভীষণ এক জীব দেখে এলাম? না কি বলবে, দেখে এলাম এক অদ্ভুত জগৎ। গ্রহবাসীরা ওদের বর্ণনা শুনে কি ভয় পাবে? আতঙ্কিত হবে? বিজ্ঞানীরা দূরবীন হাতে নিয়ে গবেষণা শুরু করবে সঙ্গে সঙ্গে?

কে জানে!—নতুন সৌরজগৎ, নতুন জীব—। ইচ্ছে থাকলেও সাধ্যি কী যে জানি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা ছাড়া কী আর করতে পারি তখন!

হ্যাঁ, অপেক্ষা করেছিলাম। দীর্ঘক্ষণ। এবং তারপর ধীরে ধীরে এগিয়েছিলাম নতুন জগতের দিকে। কিন্তু এগোতে গিয়েও বিপদ আবার। মোট সাতটি গ্রহ আমার সামনেকার সূর্যটিকে প্রদক্ষিণ করছে। কোন্‌টিতে আমি নামবো, ঠিক কোন্ গ্রহটি থেকে ওই বুদ্ধিমান জীবরা এসেছে, অনেক চেষ্টায়ও তার হদিস পেলাম না।

এদিকে সময় পেরোচ্ছে। দ্রুত। আমার চোখের সামনেই গ্রহগুলোর সূর্য-প্রদক্ষিণ চলছে। এবং একবার প্রদক্ষিণ মানেই ওদের এক বছর। অথচ আমার হিসেবে তা কয়েক মিনিটের বেশী নয়। ভয় হল। এই হারে যদি বছর গড়ায় তো সর্বনাশ। উদ্দিষ্ট গ্রহটিতে যখন পৌঁছুব, কয়েক যুগ পেরিয়ে যাবে তখন। গ্রহবাসীরাও প্রস্তুত হবার সময় পেয়ে রুখে দাঁড়াবে। তাহলে উপায়? সবুজ সূর্যটির দিকে তাকালাম আবার। আর এগোন সমীচীন হবে কিনা, জল্পনা শুরু করলাম তাই নিয়ে।

এদিকে দ্রুত সংকুচিত হচ্ছি। যদি সংকোচন এইরকম চলে তো নতুন জগতে পা দিয়ে বিপদ হতে পারে। হয়তো বা অচেনা-অজানা জীবদের তরফ থেকে বাধাও আসতে পারে। খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে নিলাম। কিন্তু কূল-কিনারা কিছু পেলাম না। অগত্যা ঠিক করলাম, এগোব। অন্ততঃ খুঁজে দেখব, একটু আগে যাদের দেখেছি, কোথায় থাকে তা'রা।

না, সহজে তাদের দেখা মেলে নি। এমনকি আরও খানিক-দূর এগোবার পরেও।

ফিরে যাবো কিনা ভাবছি, এমন সময় দেখি, লাল আভাময় একটা গ্রহ, সবুজ সূর্যটিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে আমারই দিকে এগোচ্ছে। ভীষণ বেগে ওটা এগোল, আমাকে পাশ কাটিয়ে সূর্য-প্রদক্ষিণের পথটি ধরে। আর আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম, একটি মাত্র উপগ্রহকে নিয়ে ওর এই পথ-চলা।

অপেক্ষা করে রইলাম, যতক্ষণ না গ্রহটি আবার ফিরে আসে। অর্থাৎ, ওর এক পাক সূর্য-প্রদক্ষিণের মধ্য দিয়ে পুরো একটি বছর যতক্ষণ না পেরোয়। এদিকে ওর এক বছর আমার হিসেবে কয়েক মিনিটও নয়। কিন্তু তবু, আবার যখন ও এল তখন আরও খানিকটা সংকুচিত হয়েছি। আগের তুলনায় ওর কাছে এগিয়েছি আরও। তাই এমন কিছু চোখে পড়ল এবার, প্রথম বারে যা পড়েনি।

এবার স্পষ্ট দেখলাম, রক্তিম গ্রহটির আশেপাশে মহাকাশযান। অনেক, অজস্র। যানগুলো উপগ্রহটির দিকে এগোচ্ছে। এখন আর সন্দেহ রইল না যে, এই হল উদ্দিষ্ট গ্রহ, একটু আগে দেখা উন্নত জীবদের বাসভূমি। একেই খুঁজে বেরিয়েছি এতক্ষণ। কিন্তু এখানকার জীবরা কী চায়? এত শত মহাকাশযান কেন? একবার মনে হল, যেন ওরা উপগ্রহটির দিকে এগোচ্ছে। একটিমাত্র যে চাঁদ প্রদক্ষিণ করছে ওদের গ্রহকে, তারই দিকে যেন।

কিন্তু কেন এগোচ্ছে ওরা? চাঁদের দিকেই বা কেন?—কিছুই ঠিক বোঝা গেল না। বরং দেখলাম, ওরা নিজেদের নিয়ে মশগুল। আমি এত কাছে, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। সন্দেহ হল, তবে কি নিশ্চিন্ত ওরা? একেবারেই? আমার থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করে না? নাকি আমি যে এত কাছে ওদের, তা মোটে টেরই পায়নি?

শেষ অবধি কিছুই ঠিক বোঝা গেল না। গ্রহটি তার চাঁদকে নিয়ে দূরে সরে গেল। আর আমি অপেক্ষা করে রইলাম, কখন একটি বছর পূর্ণ হবে ওর, আরও একবার সূর্য-প্রদক্ষিণ সেরে ও আমার কাছাকাছি হবে।

এবার বছর পেরোতে সময় লাগল আগের তুলনায় বেশি। কেননা আরও খানিকটা সংকুচিত হয়েছি এর মধ্যে। ছোট হয়েছি আরও অনেক। গ্রহটি কাছাকাছি আসতেই এবার এক আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ল। ঠিক গ্রহটিতে নয়, তার চাঁদটিতে। দেখলাম, যে, চাঁদের প্রায় অর্ধেকটাই কী এক ধাতব পদার্থের পাত দিয়ে ঢাকা। এছাড়া, মহাকাশ-অভিযানও চলছে। ঠিক আগের মতো। গ্রহবাসীরা দলে দলে এসে চাঁদের গায়ে নামছে। অবাক হলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নত যারা, কেন তাদের এই খেয়াল? নিজ বাসভূমি ছেড়ে চাঁদে আসা?—তবে কি বিপদ কিছু? তামাম গ্রহ জুড়ে সর্বনাশের কোনো কালো ছায়া? কিছুই বোঝা গেল না। নামাও চলল না গ্রহটিতে। কেন না, তখনও আমি আকারে বেশ বড়। এই রক্তিম গ্রহটির চাঁদের মতো প্রায়। অগত্যা আবার অপেক্ষা। গ্রহ এবং তাকে প্রদক্ষিণরত চাঁদের হিসেবে এক বছর, আর আমার হিসেবে কয়েক ঘন্টা।

দেখতে দেখতে এ সময়টুকুও পেরিয়ে গেল। গ্রহটি তার উপগ্রহকে নিয়ে আবার কাছাকাছি হল আমার। কিন্তু এবার উপগ্রহের যে চেহারা আমি দেখলাম, তা আগের বারের থেকে আলাদা। আগের বার দেখেছি, উপগ্রহের অর্ধেকটা ঢাকা, বাকি অর্ধেক জুড়ে সমুদ্র আর পর্বত। কিন্তু এবারে দেখলাম, ওই বাকি অর্ধেকও ঢাকা, যেন গোটা উপগ্রহটাই শক্ত কোনো পাত দিয়ে মোড়া।

অবাক হলাম। সন্দিগ্ধও সেই সঙ্গে,—তবে কি উন্নত জীবদেরই কারসাজি এ? ইচ্ছে করেই ওরা এসব করছে? কিন্তু এ করে

ওদের লাভ ? ওদের গ্রহে তো বটেই, উপগ্রহেও বায়ুমণ্ডল রয়েছে। তা থেকে নিজেদের আড়াল করে সুবিধে ? মনে হল, লাভ বা সুবিধে কোনোটাই নেই। অসুবিধে এবং ক্ষতিই বরং। কেননা, এভাবে আড়াল করার ফলে কৃত্রিম বায়ু উৎপাদন করতে হবে; আলোরও ব্যবস্থা করতে হবে।

অথচ কিছুরই অভাব তো ছিল না। আমি নিজেই এখন বায়ুমণ্ডলের একপ্রান্তে। গ্রহটির আকর্ষণ অনুভব করছি। এগোচ্ছি ওরই দিকে। ঠিক এইটেই চাইছিলাম;—আগে তো খোদ গ্রহটিকে দেখি, তারপর উপগ্রহের কথা ভাবা যাবে।

কিন্তু কোথায় উপগ্রহ ? দেখতে দেখতে তা আমার উল্টোদিকে চলে গেল, গ্রহ-প্রদক্ষিণের কক্ষপথটি ধরে। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রহটির বুকে নেমে এলাম। মনে হল, আমার পায়ের চাপে ওখানকার অনেক কিছু ভেঙে চুরমার। কিন্তু কী ভাঙ্‌ল ? ভালো করে তাকাতেই দেখি, যন্ত্রপাতি, কল-কারখানাজাতীয় কিছু। আসলে সবই ওখানে কারখানা। শুধু কল আর কল। জনপ্রাণী নেই। কোথাও একটি প্রাণী চোখে পড়ছে না।

অবাক লাগল। এ আবার কী ভোজবাজি ? কা'রা এসব চালাচ্ছে ? খানিক আগে দেখা বুদ্ধিমান জীবদের কথা ভাবলাম,—ওরাই নয় তো ? সন্দেহ ক্রমে বদ্ধমূল হল,—এই বিরাট যন্ত্রসভ্যতা, ওই মহাকাশযান—সব নিশ্চয় একসূত্রে গাঁথা।

কিন্তু সূত্রটি কী ? আসল রহস্য কোথায় ?—অনেক চেষ্টায়ও তা যখন খুঁজে পেলাম না তখন হঠাৎ এক আতঙ্ক ঘিরে ধরল আমায়। বারবার মনে হতে লাগল, পালাই এখান থেকে; এই প্রাণহীন ভয়ঙ্কর যন্ত্রপুরী থেকে।

একবার ভাবলাম, লাফ দিই, এ-গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ এখনও এমন কিছু নয় যে, লাফালে আমার মতো বিরাটকে ধরে রাখতে পারবে। আবার মনে হল, না, লাফানো ঠিক হবে না। কারণ,

তা করলে গ্রহটিতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। হয়তো বা সূর্যের দিকে এগিয়ে যাবে সে। সে আর উপগ্রহটি তো বটেই, অন্য কয়েকটি গ্রহও ধ্বংস হবে।

তাই ঠিক করলাম, যেমন চলছে চলুক। ব্যস্ততায় কাজ নেই। বরং অপেক্ষা করি। দেখি, শেষ অবধি কী দাঁড়ায়। কিন্তু সময় কি কাটে, শুধু যন্ত্র আর কারখানা দেখে দেখে। অগত্যা আকাশের দিকে তাকালাম। ধাতুর পাত দিয়ে ঢাকা উপগ্রহটিকে দেখলাম বার বার! এতক্ষণে সংকুচিত হয়েছি আরও। উপগ্রহটি আগের তুলনায় আরও দূরে থেকে গ্রহ-প্রদক্ষিণ করছে। আশেপাশের বায়ুমণ্ডলও পরিষ্কার ঠেকছে অনেক। এবার গ্রহটির দিকে তাকাতেই নতুন কিছু চোখে পড়ল। দেখি যে, দু'টি যন্ত্র। বিচিত্র, অদ্ভুত। আমারই দিকে এগোচ্ছে; ভাঙা ও দুমড়ানো যে কলকব্জাগুলো আমার আশেপাশে, সেদিকে।

দুটি যন্ত্রই স্বয়ং-চালিত। সরু লম্বা তিনটি করে পায়ের উপর ভর-দেওয়া। এছাড়া, দু'টি করে হাত সামনের দিকে বাড়ানো। হাত-পা ছাড়া যন্ত্রের আর বিশেষ কিছু দেখি নি। অন্য কোনো অংশ আদৌ ছিল কিনা, তা' খেয়াল করিনি।

খেয়াল করেছি বিশেষ করে ওদের হালচাল :—

এলো, এক একটি করে পা ঠুকে ঠুকে, অতি সাবধানে। এসেই হাত দুটিকে কাজে লাগাল। ভাঙা দুমড়ানো কলকব্জাগুলোকে ওঠাতে লাগল একে একে।

পাশেই ছিল ক্রেন। যেন আজ্ঞাবহ পার্শ্বচর। ভাঙা জিনিসপত্তরগুলো উঠিয়ে দিতেই চটপট কাজ হাসিল করল। সব নিয়ে ফেলল পাশেই একটা নালামতো জায়গায়। নালাটা চলমান। জিনিস নিয়ে এগিয়ে গেল দিব্যি। খানিক দূরে বিরাট এক কারখানা। দেখতে দেখতে নালাটা তার ভেতরে ঢুকল।

এতক্ষণে সংকুচিত হয়েছি অনেকটা। যন্ত্রীপুরীর মাঠ-ঘাট ধরে

দিব্যি এগোচ্ছি। না, এগোতে কষ্ট নেই। যন্ত্র বা কলকারখানা এখন আর দলিত হবার ভয় নেই। কারণ, আকারে ওরা আমার চেয়ে ছোট হলেও চোখে পড়ছিল সবকিছু।

কিন্তু তবু, সাবধানে এগোলাম। যন্ত্রপুরীকে পাশ কাটিয়ে, ধীরে ধীরে।

খানিকদূর যেতেই বিস্ময়ে হতবাক আমি। যা দেখলাম, তা অভিনব তো নিশ্চয়ই, অবিশ্বাস্যও বটে!

## ॥ দশ ॥

দেখলাম, সামনেই জল। ঘোর নীল। থেকে থেকে গর্জাচ্ছে।

তীর ঘেঁষে দাঁড়ালাম। ঠিক একেবারে জলাভূমির কিনারায়, যেখানে ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে।

সাগর কিনা ঠিক বোঝা গেল না। হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। তবে মহাসাগর না হোক, উপসাগর তো নিশ্চয়ই। বিরাট, বিশাল। যেন গিয়ে আকাশে মিশেছে।

কিন্তু আকাশের দিকে তাক করে ওগুলো কী? সাগরের ভেতর থেকে ঠিক যেন আঙুল উঁচিয়ে?—

ভালো করে তাকাতেই মনে হল, স্তম্ভ। যেন সাগর ডিঙোবার আয়োজন হচ্ছে। সেতু-গড়ার কাজ চলছে।

অবাক লাগল। এই অস্থির-উত্তাল সাগরের বুকে সেতু? কখনও সম্ভব? একবার মনে হল, কে জানে! হয়তো সম্ভব। আশ্চর্য এই যন্ত্রপুরীতে সবই সম্ভব। সেতুর সাহায্যে এখানকার মহাদেশগুলো সংযুক্ত হবে, যোগাযোগের নতুন ব্যবস্থা হবে এখানে।

তবে কী সাগরের ওপারেও স্তম্ভ গড়ে উঠছে ঠিক এইরকম? দু'দিক থেকে এক সঙ্গে কাজ চলছে?

আশঙ্কা হল, হয়তো ঠিক তাই। স্তম্ভের সারি দু'দিক থেকে এসে মাঝসাগরে মিলবে।

বেলাভূমি ধরে এগোলাম। দেখি, এক বিরাট নদী। সাগরে পড়ছে। ভালো করে দেখতেই চোখে পড়ল, নদীর উপর বাঁধ একটি। ঠিক গড়ে ওঠে নি, উঠছে। যেন জোর করে নদীর গতিপথকে পালটাবার তোড়জোর চলছে।

না, বাঁধের আশেপাশে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। যন্ত্ররা সব কাজ করছে। যেন অদৃশ্য কারও হুকুমে। কিন্তু কে এই অদৃশ্য? কে? কে?—

বৃথাই খুঁজে মরলাম সেদিন। সাগরের তীর ধরে মাইলের পর মাইল হাঁটলাম। জনপ্রাণী তো দূরের কথা, জীবনের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। এদিকে খেয়ালই করিনি, খুঁজতে খুঁজতে কখন এসে বিরাট এক শহরের প্রান্তে দাঁড়িয়েছি।

সাগরের একেবারে তীর ঘেঁষে শহর। কত কী গড়ে উঠছে সেখানে! ঘরবাড়ি, কল-কারখানা, রাশি রাশি ঝুলন্ত সেতু। সেখানে কাজ চলছে বিদ্যুৎগতিতে। আকাশ-ছোঁয়া এক একটা বাড়ি গড়তে মিনিট কয়েকের বেশি লাগছে না। যন্ত্ররা হুকুমের দাস যেন। বাড়ির মালমশলা আনছে। ক্রেন-এ করে সব ওঠাচ্ছে। নিখুঁতভাবে করছে সব কিছু। হঠাৎ দেখলাম, কয়েকটা বাড়ি হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল। গোটা দুই কারখানাও সঙ্গে সঙ্গে। আমি অবাক। এই ভাঙ্গাগড়ার কোনো অর্থ খুঁজে পেলাম না। কেনই বা গড়া হচ্ছে এগুলো, কেন ভাঙ্গা হচ্ছে, কিছুই বুঝলাম না। অগত্যা এগোই আর একটু। শহরের ভেতরে ঢুকি।

এবার চোখে পড়ে, ভাঙ্গাগড়াই এখানকার রেওয়াজ। শহরের বহু জায়গায় ধ্বংস ও সৃষ্টি পাশাপাশি। যন্ত্ররা গড়ছে একদিকে, অন্যদিকে ভাঙছে। কিন্তু কেন? কী উদ্দেশ্যে? এমন করে দুনিয়ার কোন্ উপকার হবে?—ভাবতে ভাবতে যন্ত্রগুলোকে পাশ কাটিয়ে সাবধানে পথ চলি। এই হেঁয়ালির পেছনে আদৌ কোনো সূত্র আছে কিনা, বারবার তল্লাস করি। না, এবারেও ব্যর্থ। তল্লাস

করে কিছু ফল হল না। বরং রহস্য আরও ঘনীভূত হল। এক জায়গায় দেখলাম, খনি। আকরিক লোহা-জাতীয় কী সব যেন ওঠান হচ্ছে। যন্ত্ররাই ওঠাচ্ছে। গর্তও খুঁড়ছে যন্ত্র। কাজে কোথাও এতটুকু গলতি নেই।

এগিয়ে গেলাম ; শহর ছাড়িয়ে খনিকে পাশ কাটিয়ে অনেকটা দূরে।

পাহাড় চোখে পড়ল এবার। ছোটবড়, অনেক, অজস্র। বড় গোছের একটির চূড়ায় উঠে বসলাম। না, উঠতে কষ্ট হয়নি। এর মধ্যে বেশ খানিকটা সংকুচিত হলেও পাহাড়গুলোর কোনোটাই আমার তুলনায় আট-দশ গুণের বেশি বড় ছিল না। চূড়ায় উঠে অদ্ভুত এক দৃশ্য চোখে পড়ল। একদিকে দেখলাম, শহর, সেখানে ভাঙ্গাগড়া চলছে। অন্যদিকে অতি সুন্দর এক বাগিচা। তার কোথাও সারি সারি স্তম্ভ, কোথাও মর্মরমূর্তি।

বাগিচার ঠিক গা-ঘেঁষে আর একটা শহর। আকারে আগেরটির তুলনায় অনেক বড়। এখানেও কি ভাঙ্গাগড়া ? যন্ত্রের দৌরাত্ম্য ?—ভালো করে তাকাতেই দেখি, বিরাট এক বাড়ি, গম্বুজ আকারের, শহরের ঠিক মাঝখানে। ঠিক এরকম বাড়ি এ রাজ্যের আর কোথাও দেখিনি। যেমন বিরাট এ, তেমনি সুন্দর। একে দেখা মাত্রই সন্দেহ হল, রহস্যের হদিস এখানে মিললেও মিলতে পারে। তাই এগোলাম এবার ; এক মুহূর্তও দেরী না করে। পথ চলতে গিয়ে দেখি, যন্ত্ররা যথারীতি কাজে ব্যস্ত। ভাঙ্গাগড়া ঠিক তেমনি চলছে।

এদিকে গম্বুজ-আকারের বাড়িটির কাছাকাছি হতেই বিপদ। মনে হল, যন্ত্ররা আমার পথরোধ করছে। তীক্ষ্ণ বর্শার ফলকের মতো কী সব যেন সামনে। দিব্যি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। ফলকদের এতক্ষণ দেখিনি। গম্বুজটির কাছে আসতেই সব যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল। অবাক হলাম,—এ আবার কোন্ ভোজবাজি ?

কিন্তু না, তবু ভয় পাইনি ঠিক। কেননা তখনও এদের তুলনায় আকারে আমি অনেক বড়।

বাধাগুলোকে ডিঙিয়ে গম্বুজটির ভেতরে ঢুকলাম। আমার মাথা প্রায় ছাদে গিয়ে ঠেকল। মনে হল, না, নিরাশ হইনি। এতক্ষণ ধরে যা খুঁজছি, তা আমার সামনেই। হ্যাঁ, আসল যন্ত্রটি একেবারে মুখোমুখি। বিরাট এই যন্ত্রসভ্যতাকে সে-ই চালাচ্ছে। এখানকার সবরকম কাজকর্মের নিয়ন্ত্রক সে। সমস্ত শক্তির উৎস। অবাক বিস্ময়ে যন্ত্রটির দিকে তাকালাম। মনে হল, প্রায়-বৃত্তাকার সে ; বহুরকম কলকব্জার সমন্বয়ে জটিল।

কী নেই সেখানে? গীয়ার, সুইচবোর্ড ও লিভার থেকে শুরু করে ছোটবড় অজস্র টিউব ও টায়ার পর্যন্ত। সবই নিখুঁতভাবে চলছে, আপনার থেকেই ; কোথাও - তটুকু ভুলচুক নেই।

কিন্তু এর কোন্ অংশটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? ঠিক কোন্ জায়গাটা? —ভাবতে গিয়ে মনে হল, বৃথাই মাথা ঘামাচ্ছি। অংশবিশেষ নয়, গোটা যন্ত্রটাই গুরুত্বপূর্ণ। সবটা মিলিয়ে এই যন্ত্রপুরীর মস্তিষ্ক।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মস্তিষ্ক। চিন্তা, বুদ্ধি সব কিছুরই উৎস হল এ। এরই জন্যে দীর্ঘক্ষণ তল্লাস করেছি। পাহাড়ের চূড়ায় আর সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আকাশপাতাল ভেবেছি। এতক্ষণে এর হদিস মিলল। কিন্তু এর কাজকর্ম বড় অদ্ভুত ঠেকছে। মনে হচ্ছে, কিছু অদৃশ্য তরঙ্গের এ উৎস। যেন সব দিকেই তরঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু দিয়ে লাভ? অদ্ভুতদর্শন এই যন্ত্রদানবের সার্থকতা? —রাগে বিরক্তিতে একবার ইচ্ছে হল, এখনই এটাকে চুরমার করি। হ্যাঁ, করবো বলে এগিয়েও ছিলাম। ধারে-কাছেই কোনো একটা অস্ত্রের খোঁজ করছিলাম। কিন্তু না, অস্ত্র মেলে নি। অগত্যা খালি হাতেই এগোলাম। সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে! হঠাৎ মনে হল, চৌকোমত একটা জায়গায় সবুজ আলো ; উজ্জ্বল, তীব্র। আলোটা এতক্ষণ ছিল না। আমাকে এগোতে দেখেই জ্বলে উঠল।

বুঝে নিলাম, এ মস্তিষ্কের কারসাজি। আমার মতলব টের পেয়েছে। অগত্যা থমকে দাঁড়াই। এদিক-ওদিক দেখি। এমন সময় অদ্ভুত এক অনুভূতি হঠাৎ আচ্ছন্ন করে আমায়। মনে হয়, ধারেকাছেই কে যেন ক্রুদ্ধ। দারুণ বিরক্ত আমার উপর। ঘৃণায় ও বিদ্বেষে সে যেন জ্বলছে। কিন্তু কে আবার জ্বলবে?—নিজেকে সান্ত্বনা দি, যন্ত্র ছাড়া এখানে আছেই বা কী? তুচ্ছ যন্ত্রে কি কখনও অনুভূতি জাগে? সে আবার আশেপাশে তা ছড়িয়ে দেয়? না না, এ আমার ভুল। বৃথাই নিজেকে সংশয়ের জালে জড়াচ্ছি।—

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে এগোলাম আবার। ঘৃণা ও বিদ্বেষের অনুভূতিটা আগের তুলনায় আরও বাড়ল। ধারেকাছেই ক্রুদ্ধ কিছু একটার অস্তিত্ব আরও প্রকট হল। কিন্তু আমি তখন মরিয়া। যেন আক্রোশ-বশেই যন্ত্রটির দিকে চললাম।

খুব কাছাকাছি হয়েছি, হাত বাড়ালেই যন্ত্রের নাগাল পাবো, এমন সময় তাজ্জব এক ব্যাপার ঘটল। ঘরের এক কোণে নীল আলো জ্বলে উঠল হঠাৎ। ঠিক সাধারণ আলো নয়, আলোর ঝালর; মেঝে থেকে ছাদ অবধি ছড়ান।

ঝালরটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। আমারই দিকে যেন। আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ। আশঙ্কায় হতবাক। ভাবলাম, নিশ্চয় এ-ও যন্ত্রের কীর্তি। আমাকে এগোতে দেখে সাবধান করছে। না, আর এগোন ঠিক হবে না। এক চুলও নয়। এখানে মুহূর্তও দেরি করা উচিত নয় আর।

পিছিয়ে এলাম। তাড়াহুড়ো করেই একরকম। আবার এগোলাম পাহাড়-পর্বতের দিকে। এই হল আমার উপযুক্ত জায়গা। কেননা, খানিকক্ষণের মধ্যেই আমি এত ছোটো হবো যে এসব যন্ত্রের এলাকায় চলাফেরা করা আর উচিত হবে না। এর চেয়ে পাহাড়ের চূড়া অনেক নিরাপদ। যন্ত্রের দৌরাত্ম্য নেই ওখানে। মস্তিষ্কের কেরামতি নেই।

মস্তিষ্ক! হায়! অচেনা ওই জগৎ ধরে হাঁটবার আবার আক্রোশ

আমাকে ঘিরে ধরল.—যদি পারতাম! বিদঘুটে ওই মস্তিষ্কটাকে চুরমার করে দিতে! কী হবে ও দিয়ে? সৃষ্টির কোন্ উপকার? না, থাক। যন্ত্র তার জগৎ নিয়ে থাক, একবার সান্ত্বনা দিলাম নিজেকে, —সোনালী জীবগুলো, যারা নাকি পাখির মতো উড়ে বেড়ায়, যারা একদিন এখানে থাকতো, আপাততঃ তা'রা নিশ্চিন্ত। উপগ্রহটিতে সাফল্যের সঙ্গেই তারা পাড়ি দিয়েছে। অতএব, যন্ত্র এখানে যা খুশি করুক ; কারও কিছু যায়-আসে না।

এদিকে পাহাড়-এলাকায় যখন পৌঁছুলাম, প্রায়-সন্ধ্যে তখন। চারিদিক ক্রমেই রহস্যময় ও অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

খানিকটা উচুঁতে উঠতে উঠতে রাত্রি হল। রহস্য ঘনীভুত হল আরও। এখন অনেক দূরে খুদে-খুদে আলো ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। যন্ত্ররা যে এখনও পুরোদমে কাজ করছে, তা ওই সব আলোর চলাচল দেখে মালুম হচ্ছে। আর শুধুই কি আলো! শব্দ ভেসে আসছে কত রকম! মৃদু মর্মরধ্বনির মতো কোনোটা। কোনোটা গোঙানির মতো।

শেষ অবধি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলাম। এবার দূরে, আলোর চলাচল আরও স্পষ্ট হল। গম্বুজ-আকারের বাড়িটি, যেখানে এই যন্ত্রপুরীর মস্তিষ্ক, আলোর দৌলতে তাও চোখে পড়ল। এখন দেখছি, গম্বুজের চূড়ায় গোলাকার কী যেন। মজবুত কিছু খুঁটির উপর বসানো। ওখানে কাজ চলছে। ভীষণ তাড়াতাড়ি।

আশ্চর্য! কিছুতেই ভেবে পেলাম না, গোলক এল কোত্থেকে! খানিক আগেও গম্বুজটিকে দেখেছি। কিন্তু ঠিক এরকম তো নয়!

তাকিয়ে রইলাম! এক দৃষ্টিতে। গোলকটির ভেতরে নানান সব যন্ত্রপাতি ঢুকছে, মনে হল। এবং খানিক বাদেই যা ঘটল মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না তার জন্যে। হঠাৎ দেখি, গোলকটি ধীরে ধীরে শূন্যে উঠছে। যেন পালক, আলতোভাবে কেউ উঠিয়ে দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে গোলকটি অনেক উপরে উঠল। যেন চোখের

পলকে আলোর একটি বিন্দুতে পরিণত হল। ক্রমে এই বিন্দুও চোখে পড়ল না আর। যেন মহাশূন্যের বুকে মিলিয়ে গেল সব কিছু।

ব্যাপার কী?—আবার জল্পনা শুরু করলাম—তবে কি যন্ত্র আপনার থেকেই মহাকাশ-অভিযানে বেরোল? যন্ত্রপুরীর মস্তিষ্ক মিনিট কয়েকের মধ্যেই মহাকাশযান গড়তে সক্ষম?···হ্যাঁ, গড়েছে সে; আমি তার কাছ থেকে এই পর্বত-চূড়ায় আসবার অবসরে। কিন্তু গড়ে লাভ? এই মহাকাশ-ভ্রমণের সার্থকতা?

সন্দেহ হল, যন্ত্র এখানে জীবনকে ছাড়িয়ে গেছে। এই গ্রহে একদিন যারা থাকতো, যন্ত্রের উপর বেশি নির্ভর করতে গিয়ে নিজেদের সর্বনাশ তা'রা নিজেরাই ডেকে এনেছে। যন্ত্র কালক্রমে আধিপত্য বিস্তার করেছে তাদের উপর। শেষ পর্যন্ত তাদের গৃহছাড়া করে ছেড়েছে।

অবাক লাগল ভাবতে, এই সোনালী জীবগুলো, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নত, তাদের এই দুর্দশা? নিজেদের গ্রহ ছেড়ে উপগ্রহে আজ তারা প্রবাসী?

কিন্তু উপগ্রহেই বা নিশ্চিন্তি কোথায়! যন্ত্র পিছু ধাওয়া করছে ওদের। মহাকাশ-অভিযানে বেরোচ্ছে। উপগ্রহটিকে আচ্ছাদিত করেই কি ওরা রেহাই পাবে? না কি লড়াই হবে নতুন করে? যন্ত্র বনাম জীবনের লড়াই? জীবন হেরে গেলে উপগ্রহও হাতছাড়া। নতুন কোনো গ্রহে পাড়ি আবার।

আমি আশ্চর্য এক সভ্যতার ছবি আঁকলাম মনে মনে।—সোনালী প্রাণীর সভ্যতা;—ধীরে ধীরে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হচ্ছে ওরা। যন্ত্রকে দিয়ে নিত্য নতুন নতুন কাজ করিয়ে নিচ্ছে। অবশেষে একদিন;—স্বর্ণযুগ এলো। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মাত্র সাহায্য নিয়ে তামাম যন্ত্র-সভ্যতা চলতে লাগল। না, অন্য আর কারও দরকার নেই। যন্ত্র সেখানে হুকুমের দাস। সবরকম কাজ রুটিনমাফিক করে।····এই রুটিন নিয়েই বিপদ শেষকালে।

যন্ত্র একদিন তার স্রষ্টাকে টেক্কা দিল। মুষ্টিমেয় যারা ওদের চালাত, তাদের হুকুম আর তামিল করল না। যেন বিদ্রোহী হল রাতারাতি। স্রেফ নিজের ইচ্ছামতো চলল।....বিজ্ঞানীদের তখন মাথায় হাত! ইঞ্জিনীয়াররা চিন্তিত। সকলের মুখেই এক কথা, ভুল হয়ে গেছে; মারাত্মক ভুল। যন্ত্রের উপর এতটা বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি।....এখন উপায়?—বিশেষজ্ঞরা এ ওর মুখের দিকে তাকান।....এদিকে যন্ত্রশক্তি দুর্বার। জীবনকে চ্যালেঞ্জ করছে; তামাম গ্রহ জুড়ে আধিপত্য বিস্তারে উদ্যত।....বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞরা মিলে অনেক চেষ্টা করলেন সেদিন। যন্ত্রকে বশে আনবেন বলে কত কী ফন্দী-ফিকির আঁটলেন। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হল না। যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ঘরছাড়া করল জীবনকে।

ঘর?—পরক্ষণেই নতুন এক প্রশ্ন মনে এলো,—সোনালী প্রাণীদের আসল ঘর কোথায়? এই গ্রহেই যে বরাবর, তার প্রমাণ কি? এমনও তো হতে পারে, অন্য কোনো গ্রহে ওরা ছিল! যন্ত্র ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। হয়তো বা এই গ্রহটিতে কিছুকাল শুধু আশ্রয় নিয়েছিল ওরা। যন্ত্র তা টের পেয়েছে। আর পাওয়া মাত্রই অনুসরণ করছে ওদের। ওরা তাই এখান থেকেও পালিয়ে গেল। উপগ্রহে আশ্রয় নিল শেষ অবধি। কিন্তু ওখানেই কি ওরা টিকতে পারবে? যন্ত্র কি আঘাত হানবে না?

একবার মনে হল, আঘাত সম্বন্ধে সজাগ ওরা। উপগ্রহটিকে তাই আচ্ছাদিত করছে। ধাতব পদার্থ দিয়ে ঘিরছে। আসলে ওরা এখনও যন্ত্রকে বশে আনবার চেষ্টায়। তা না হলে ইচ্ছে করলেই তো আরও অনেক দূরে যেতে পারত। এই গ্রহটি থেকে কোটি কোটি, কোটি কোটি মাইল দূরে। ওদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সেই কোথায়! উপগ্রহটি থেকে কত কোটি কোটি মাইল দূরে! এত দূরে ওরা তো গিয়েছিল। মহাকাশ ঠিক পাড়ি দিয়েছিল।

আচ্ছা, পারবে কি ওরা ?—নিজেকেই প্রশ্ন করি সেদিন,—পারবে ? যন্ত্রকে বশে আনতে ? যদি পারে তো ভালো। আর না যদি পারে তো সর্বনাশ। যন্ত্ররা দিগ্বিজয় শুরু করবে; প্রথমে এই সৌরজগৎ, তারপর অন্যান্য জগৎ। এবং তারপর···তামাম এই নক্ষত্রমণ্ডল, এই বিশ্বমণ্ডল····

আর ভাবতে পারি না। আতঙ্কে, দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠি। বার বার নিজেকে ধিক্কার দিই, ছি ছি! এ আমি কী করলাম! যন্ত্র-দানবের একেবারে কেন্দ্রটিকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ধ্বংস করলাম না। আর একটু তৎপর হলেই তো কাজ হাসিল হত। বিরাট এই বিশ্বমণ্ডলের কত উপকার হত।

বিশ্বমণ্ডল!—কথাটা মনে আসতেই নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবি। লক্ষ্য করি, অনেক ছোটো হয়েছি এতক্ষণে। খানিক আগেকার তুলনায় অনেক অনেক গুণ ছোটো! অতএব, বেশিক্ষণ আর এ জগতে নয়। নতুন জগতে পাড়ি আবার। নতুন কোনো নক্ষত্রমণ্ডলে।

## ॥ এগারো ॥

কত বলবো ? কত শত পৃথিবীর কথা ? ঐ যন্ত্রপুরী থেকে বিদায় নেবার পর যা আমি দেখেছি, তা কি বলে শেষ করা সম্ভব ?

না না, কোনদিনই নয়। আর তাছাড়া বলে লাভ ? না আছে আমার সময়, না ইচ্ছে। এত কিছু আমি দেখেছি, এত রকমের পৃথিবী, এত সৌরজগৎ, নক্ষত্রমণ্ডল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—যে এদের সকলের কথা বলতে গেলে প্রচুর অবসর চাই। ধৈর্যও চাই বলবার। অথচ সময় বা ধৈর্য, কোনোটাই আমার নেই। তাই আভাস দেবো শুধু। সংক্ষেপে শুধুমাত্র সূত্রটিই তুলে ধরবো।

স্রিন্‌কস্‌-এর দৌলতে ক্রমেই সংকুচিত হতে লাগলাম। ছোটো থেকে ছোটো, আরও ছোটো। এদিকে সৃষ্টি-রহস্যের জটও খুলতে লাগল ক্রমেই। এক একটা জগতে আসি, বিরাট থাকি প্রথমে, সংকুচিত হতে হতে শেষটায় অণুর আকার ধরি। সেখান থেকে

নতুন জগতে আবার। পরমাণু আর ইলেকট্রনরা নতুন নতুন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য-দুয়ার খুলে দেয়।

হ্যাঁ, রহস্যই শুধু। একের পর এক। অনন্ত, অসীম। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দিক দিয়ে নতুন। জীবন ও বুদ্ধির দিক দিয়ে অভিনব কেউ কেউ।

জীবন? বুদ্ধি? কী বলছি আমি? কোন্ মাপকাঠিতে বিচার হবে এদের? জীবন সম্পর্কে আমার ধারণাই যে বদলে গেছে! আগে জানতাম, জীবনের নানা লক্ষণ; জানতাম, প্রটোপ্লাজ্ম্-এর অস্তিত্ব। কিন্তু এখন জেনেছি, ভুল এসব; জীবন আরও নানাভাবে থাকতে পারে। নানা পৃথিবীতে, নানা প্রকারে।

পৃথিবী কত রকমের যে দেখেছি! তরুণ কেউ কেউ, উত্তপ্ত, অগ্ন্যুদ্গীরণ করছে, বাষ্প ও ধূম ছড়াচ্ছে। আবার কেউ কেউ জরাজীর্ণ, শীতল, অন্ধকার ও বায়ুহীন। কোথাও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সভ্যতা, কোনো সুসভ্য জাতি আরও কিছুকাল বাঁচবার আশায় জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। কোথাও আবার পৃথিবীর গায়ে বিরাট সব গহ্বর, শুকিয়ে যাওয়া সাগরের চিহ্ন। কোথাও হিংস্র সব জন্তু-জানোয়ার, আমাকে রুখবে বলে বদ্ধপরিকর....কোথাও মরুভূমি শুধুই; ভীষণদর্শন, অদ্ভুত।....কোথাও আবার বালির বুকে আশ্চর্য সব চিহ্ন, লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার হারিয়ে-যাওয়া কোনো সভ্যতার ইঙ্গিত হয়তো।

এছাড়া, আরও দেখেছি, আশ্চর্য সব জগৎ....জীবনের আনন্দে ভরপুর....আলো ও তাপের আশীর্বাদে মায়াময়....দেখেছি, চোখ-ভোলানো শহর....মনমাতানো ফুলবাগিচা....দেখেছি, আনন্দ উৎসব আর সুখের প্লাবন কোথাও....কোথাও আবার জাহাজ চলছে, মহাকাশযান ছুটছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কত এগিয়েছে সব!

অনেকে আবার পিছিয়ে। জীবনকে বরণ করছে সবে। তপ্ত সাগর থেকে বেরোচ্ছে এককোষী প্রাণীর দল; হয়তো বা নতুন জেগে-ওঠা কোনো মহাদেশের দিকে।

অনেক জগতে সরীসৃপ শুধুই....অনেকের বুকে আবার পাখি, পোকামাকড়, রঙ্-বেরঙের গাছপালা।....এছাড়া, এমন জগৎও অনেক আছে, যেখানকার জীবনকে ধরাবাঁধা কোনো পর্যায়ে ফেলা যায় না।.... জীবরা সেখানে বায়বীয়, তরল শিখার মতো, আর না হয় স্তম্ভের মতো অনেকটা....মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে উঠে অদ্ভুতভাবে রয়েছে।

শুধুমাত্র শব্দময় পৃথিবীও দেখলাম! কেবলই শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ওখানে....আর দেখলাম, অতি-উন্নত এক ধরনের জীবন, যা নাকি বুদ্ধির সমন্বয়ে গড়া, যার আকার নেই, যাকে চোখে দেখা যায় না, শুধুমাত্র ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা প্রজ্ঞা দিয়ে অনুভব করা যায়।

এছাড়া, মহাকাশ-অভিযানও অনেক দেখলাম।....বিভিন্ন পৃথিবীর উপর আধিপত্য নিয়ে লড়াই কোথাও....কোথাও আবার মারাত্মক রশ্মি দিয়ে পৃথিবীর ধ্বংস।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ধ্বংস কোথাও, কোথাও আবার নতুন গ্রহের জন্ম। কোথাও সৌরজগতের অবলুপ্তি, কোথাও উদ্ভব।

এছাড়া, ব্রহ্মাণ্ডও নানারকম। মৃত কোনোটি, কোনোটি মুমূর্ষু।

এক ব্রহ্মাণ্ডে দেখলাম, আলো শুধুই : তামাম মহাশূন্য জুড়ে শুধু আলো। ব্রহ্মাণ্ডটি যেন পাত্‌লা ঝিল্লী-জাতীয় কিছুর আবরণে ঢাকা।

আমি আবরণ ভেদ করে তা'তে ঢুকলাম। মনে হল, অদ্ভুত ও আশ্চর্য কিছু। মহাকাশে সচরাচর যেমন আঁধার চোখ পড়ে, এখানে তা নেই। এখানে কেবলই আলোক....আর মাঝে মাঝে বিন্দু....আঁধার দিয়ে গড়া। ওই বিন্দুগুলো হল জ্বলেপুড়ে নিঃশেষিত হওয়া সূর্য আর প্রাণিহীন গ্রহ....না, দীপ্ত সূর্য ওখানে একটিও দেখি নি, আলোকিত কোনো গ্রহও না।

অবাক লাগল। ভেবে পেলাম না, এত আলোর মূলে তবে কী! এই ব্রহ্মাণ্ডই বা কেন?

ব্রহ্মাণ্ড! বিশ্বজগৎ! পৃথিবী!—কথাগুলো বড় অদ্ভুত ঠেকে আমার কাছে। কিছুতেই এদের আদি-অন্ত খুঁজে পাই নে।

প্রথমে অবশ্য খুঁজব ভেবেছিলাম। মোট কতগুলো জগৎ, কটা

পৃথিবী আমি দেখছি, ভেবেছিলাম, তার হিসেব রাখবো। কিন্তু তিরিশ, কি বড় জোর চল্লিশ অবধি গুনে দেখলাম, হিসেব অযথা। ব্রহ্মাণ্ডের শেষ নেই। পৃথিবীর অন্ত নেই।

অবশ্য প্রতিবারই মনে হত, এই বুঝি শেষ খুঁজে পাবো। জগৎ-রহস্যের কিনারা হবে এবার। কিন্তু না, তা আর হল না! দেখি যে, শেষের পরেও শেষ আছে। জগতের পর জগৎ।

আজ ভাবি, তা তো থাকবেই। সৃষ্টির শেষ দেখবো, সাধ্যি কি! পরমাণুকে নিয়ে অণু। প্রতিটি পরমাণু আবার অণুর ধাঁচে গড়া। সেখানে আবার নতুন জগৎ, নতুন ব্রহ্মাণ্ড। না না, এর আর শেষ নেই, এ খেলার অন্ত নেই। এ চলেছে, চলবে।

কিন্তু তবু, আমি ক্লান্ত। ভীষণভাবে। ঠিক দেহ বা মনের দিক থেকে নয়, অন্য এক ধরনের ক্লান্তি আমায় আচ্ছন্ন করছে।

মৃত্যু—শুধুমাত্র মৃত্যুই এ-থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু হায়, আমার যে মৃত্যুও নেই। জরা, ব্যাধি, বিনাশ—কিছুই নেই। আমি অজর, অমর, শাশ্বত। শুধু দেখছি, বিশ্বভুবন জট খুলছে একে একে। নিজেকে মেলে ধরছে।

কত কী-ই যে দেখলাম! কত ব্রহ্মাণ্ড, কত পৃথিবী, কত রকমের যে জীবন!

যত রকমের জীবনকে দেখেছি, প্রধানতঃ দু'টো শ্রেণীতে তা'রা পড়ে। এক হল খুব নীচু শ্রেণীর, জীব হিসেবে অনুন্নত। অপর শ্রেণী ঠিক এর উল্টো; জ্ঞানবিজ্ঞানে, ভাবনায়-চিন্তায় আমার চেয়েও অনেক এগিয়ে।

অনুন্নতরা অনেক সময় ভয় পেত। কেউ বা রুখে দাঁড়াত আমায় দেখে। কিন্তু যারা উন্নত, লক্ষ্য করেছি, ভীষণ কৌতূহল তাদের; আমায় জানবে বলে তাদের দারুণ আগ্রহ। তাদের ভয়ডর নেই। আমার কাছ থেকে খবর-সংগ্রহ করবে বলে সারাক্ষণ তা'রা ব্যস্ত।

এখানে ওই উন্নতদের কথাই সংক্ষেপে বলবো।

ওরা যুগের পর যুগ ধরে আমায় লক্ষ্য করেছে। নীহারিকার

ওপার থেকে আমি আসছি, কালো ছায়া পড়ছে নক্ষত্রমণ্ডলের উপর, কিছুই ওদের নজর এড়ায় নি।

ওরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমায় স্বাগত জানিয়েছে। ওদের কৌতূহল বিজ্ঞানীসুলভ, কাণ্ডকীর্তি বুদ্ধিদীপ্ত। আমি অবিরাম সংকুচিত হচ্ছি দেখে খুবই অবাক হয়েছে ওরা, কিছুতেই ভেবে পায় নি, কী করে এ সম্ভব। পরে 'টেলিপ্যাথি'র সাহায্যে সব কিছু যখন বুঝিয়ে বলেছি, তখন অবশ্য সব ওরা মেনে নিয়েছে। 'শ্রিনক্স্-' এর আবিষ্কর্তা অধ্যাপকটিকেও তারিফ করেছে অনেকেই। বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে উনি যে অসাধারণ, সবাই তা স্বীকার করেছে।

বহু-ব্রহ্মাণ্ড ও বহু-পৃথিবীর কথা শুনে অনেকেই হতবাক। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখলাম, জগতের মধ্যে জগৎ এবং তার মধ্যে যে আবার নতুন জগৎ থাকতে পারে সে-ধারণা আগে থাকতেই ছিল।

এক জায়গায়। সবাই মিলে আমায় উজবুক ঠাওরাল। বললো, ছি ছি! বুদ্ধিসুদ্ধির দিক থেকে তুমি তো কিছুই নও। তবে হ্যাঁ, তোমার ঐ অধ্যাপক, যিনি শ্রিনক্স্ আবিষ্কার করেছেন, নিশ্চয়ই উঁচুদরের লোক তিনি। তোমার মতো মূর্খের তুলনায় কয়েক শতাব্দী এগিয়ে।

এখানে বলে রাখি, আমায় মূর্খ বা উজবুক ঠাওরাবার কারণ, ওদের হালচাল প্রথমটায় ঠিক ধরতে পারি নি। বুঝতেই পারি নি, আসলে কী চায় ওরা।

অবশ্য ওদের চেয়েও উন্নত জীবন আমি দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, জীবন, জীব নয়; শুধু প্রজ্ঞা বিবেক আর বুদ্ধির নির্যাস। চোখে দেখা যায় না ওদের, অনুভব করা যায়।

ওরা কোনো কোনো গ্রহকে আশ্রয় করে আছে। গ্রহের মাটি বা পাথরকে নয়, আকাশকে। আসলে মহাশূন্যে বিলীন ওরা; এত অগ্রসর যে জাগতিক সবরকম মলিনতা থেকে মুক্ত।

ওরা খুবই সহৃদয়; আগাগোড়া আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। নানাভাবে সাহায্য করেছে, নতুন কত কী বুঝতে শিখিয়েছে।

ওদেরই কোনো এক গোত্র; কোথায় কোন্ এক গ্রহে জীবন সম্পর্কে আমার ধারণা একেবারে বদলে দিল। আমি জানলাম, ইচ্ছাশক্তি বস্তুকে সম্পূর্ণ বশ করতে পারে।

উদাহরণ দিয়ে বলি। একবার, কোনো এক গ্রহে কী এক পাহাড়ের চূড়ায় কেমন করে যেন পৌঁছে গেছি। তাড়াতাড়ি চুড়া থেকে নামা দরকার। কারণ, ওটা আসলে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। ওখানে বিস্ফোরণ শুরু হবার ঠিক আগের অবস্থা। থেকে থেকে চারিদিক কাঁপছে। ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে চুড়া থেকে। অথচ নামার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

কী করি, কোথায় যাই, ভাবছি, এমন সময় দেখি, উজ্জ্বল এক আলোক-রশ্মি; আমার চূড়াটি থেকে খানিকটা দূরের আর একটি চূড়া অবধি ছড়িয়ে।

কী করলাম, না, শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আলোক-রশ্মিকে বশে আনলাম সেদিন। ঐ রশ্মিপথ ধরে এগোলাম। না, পড়ি নি; হোঁচট খাই নি; নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল।

আসলে এখন আমার নতুন জীবন। আগের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। সব কিছু তাড়াতাড়ি বুঝি এখন, খুঁটিয়ে বুঝি। সিদ্ধান্তও নি চটপট। এখন আমার ভাণ্ডারে কত অভিজ্ঞতা! তবু আমি ক্লান্ত।

কতবার প্রশ্ন করেছি নিজেকেই, কেন এমন হল?

জবাব পাই নি কিছু। তবে সন্দেহ হয়েছে এক একবার, ক্লান্তি হয়তো মহাজাগতিক কোনো বিকিরণের জন্যে। অথবা আমার নিঃসঙ্গতার জন্যে।

হ্যাঁ, আমি নিঃসঙ্গ। দারুণ নিঃসঙ্গ। আমার কেউ নেই। না আত্মীয়, না বন্ধু, না প্রিয়জন। যারা একদিন ছিল, কবে কোন্ যুগে তা'রা হারিয়ে গেছে। তা'রা কত লক্ষ আলোক-বছর পেছনে এখন, কে জানে!

আলোক-বছর। না না, তা'ই বা কী করে সম্ভব? যা দেখছি, সাধ্যি কী যে আলোক তার পরিমাপ করে।

অথচ আগেকার হিসেবে আমি তো কাছেই এখনও। অধ্যাপকের সেই টেবিলের উপরেই।....সেই টেবিল, সেই রেঃসীনিয়াম্‌-এক্‌স্‌।

হায়! এত কাছে আমি, আবার এত দূরে! স্থান ও কাল—দু'দিক থেকেই।

কে জানে, কত বছর পেরোল এর মধ্যে। তবে নিশ্চয় তা অনেক। সাধারণ একজন যতদিন বেঁচে থাকে, তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি।

সাধারণ! কী বলছি আমি? ওদের সঙ্গে যোগ এখন কতটুকু? এখন আমি তো চিরজীবী, অমর।

হ্যাঁ হ্যাঁ, অমর। জীবের এত প্রার্থনা যার জন্যে, যুগ যুগ ধরে যার জন্যে এত সাধনা, আমি না-চাইতেই তা পেয়েছি।

অথচ আমার প্রার্থনা এখন একটাই; আর তা হল মৃত্যু।

উন্নত জীব, যাদের আমি দেখেছি, বেশির ভাগই তা'রা মৃত্যুকে জয় করেছে। ইচ্ছে করলে তা'রা আমাকে মুক্তি দিতে পারত। এতটুকু কষ্ট না দিয়েও এই যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দিতে পারত। কিন্তু না, তা'রা তা দেয় নি; বারবার আবেদন সত্ত্বেও।

লক্ষ্য করেছি, অনেক জানে তা'রা। এমনকি আমার সংকোচন বন্ধ করার প্রক্রিয়া পর্যন্ত। কিন্তু জেনেই বা লাভ? কেউ কি কান দিল আমার কথায়? অনুরোধ রাখল?

কতবার বলেছি, ওগো, শোন তোমরা। দয়া করে মুক্তি দাও।

কিন্তু মুক্তি তো দূরের কথা, কেউ জবাব পর্যন্ত দেয় নি। বরাবর এড়িয়ে গেছে। যেন শুনেও শুনছে না, এইরকম ভাব দেখিয়েছে।

আজ বুঝি, কেন ওরা এমন করত।—আসলে ওরা আমার মুক্তি চায় না। ওরা চায় না যে আমার সংকোচন থামুক। আমি যে মহাসৃষ্টির বুকে কলঙ্ক; যা জানা উচিত নয়, তাই জানছি। ক্রমাগত সংকোচনের মধ্য দিয়ে অনধিকার-চর্চা করছি।

এর শাস্তি পেতেই হবে। অনধিকার-প্রবেশের দণ্ড এ। অনন্তকাল ধরে এ চলবে।

অনন্তকাল!—ভাবতেও পারি না যে! না না, ভাবতে পারি

না; কিছুতেই না। এ যে নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক! কেমন করে একে মেনে নেব?

আমি তো ইচ্ছে করে এখানে আসি নি। আসতে আমি চাই নি। জোর করে আমাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক দিয়েছেন; আমার ইচ্ছের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

অধ্যাপকের ভুলের জন্যে কি আমি দায়ী?

দেখছি, দায়িত্ব শুধু আমারই। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। কেউ সঙ্গী হবে না, সান্ত্বনা দেবে না—অনন্তকাল ধরে আমাকে একা চলতে হবে।

কী ভীষণ একা আমি! কী অদ্ভুতরকম নিঃসঙ্গ! আমার দোসর মহাসৃষ্টির বুকে আর কি একজনও আছে?

না না, কেউ নেই আর। তাই নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিই। বারবার ভাবি, কিছু একটা পরিবর্তন নিশ্চয় হবে।

আমি একই সঙ্গে চরম আশাবাদী, আবার চূড়ান্তরূপে হতাশ; ভীষণ ক্লান্ত, আবার একেবারেই ক্লান্তিহীন; দারুণ অবসন্ন, আবার দুর্দান্ত গতিশীল। আমি থামতে জানি না, হাসতে জানি না, কাঁদতে জানি না; শুধু জানি চলতে।

চলার পথে অদ্ভুত এক সূর্যের দিকে চোখ পড়ল একবার। হলুদ-রঙা সূর্য, বড় সুন্দর দেখতে। কেন জানি না, ওকে দেখেই আমার মনে ধরল। অথচ আশেপাশে আরও অনেকে ছিল। আকারে ওর চেয়ে আরও অনেক বড়।

প্রথমে দেখলাম, দূরে বহুদূরে হলুদ-রঙা সূর্যটি নীহারিকার বুকে আশ্চর্য, অপরূপ।

দেখা-মাত্রই ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করলাম। সূর্যটির কাছাকাছি এলাকায় হাজির হলাম গিয়ে।

এখানে বলে রাখি, নিত্য নতুন নতুন জগৎ-পরিক্রমা করে ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগ আমি শিখেছি! অভিজ্ঞতা, শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা আমার মনকে আগের তুলনায় আরও অনেক সচল ও সজাগ করেছে।

তবে হ্যাঁ, আলোর চেয়ে বেশি দ্রুত কখনও চলি নি। মনে হয়েছে, যেভাবে চলছি, তা'তে আলো বা তার কাছাকাছি কোনো গতিবেগই যথেষ্ট। এছাড়া সংশয়ও ছিল, আলোর গতিকে ছাড়ালে বস্তু আর বস্তু থাকে না ; শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

এদিকে হলুদ-রঙা সূর্যের কাছাকাছি হয়েছি। চোখে পড়ছে, কয়েকটি গ্রহ তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কোনো কোনো গ্রহ একা নয় আবার! এক বা একাধিক উপগ্রহকে নিয়ে রীতিমত বিস্ময়কর।

সবচেয়ে বিস্ময় জাগল নীল একটি গ্রহকে দেখে। ঠিক ঘোর-নীল নয়, ফিকে-মতো ; যেন হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে।

অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করলাম। মনে হতে লাগল, যাবো ওতে, যেমন করে হোক। এদিকে তখনও আমি বিরাট ওই নীলচে গ্রহটির চেয়ে আকারে বহুগুণ বড়। তাই ঠিক করলাম, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াই খানিকক্ষণ। অন্য কয়েকটি সূর্যকে দেখি ; তারপর এর কথা ভাবা যাবে।

অবশ্য ঘুরতে গিয়েও বিপদ ; সারাক্ষণ সজাগ থাকতে হল, হলুদ-রঙা সূর্যটি নক্ষত্রের ভিড়ে না হারিয়ে যায়। নীলচে গ্রহটি না নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

না, শেষ অবধি তা হয় নি। হারায় নি কেউ। ঠিক এগিয়ে-ছিলাম ; হলুদ-রঙা সূর্যের নীলাভ গ্রহটির দিকে।

॥ বারো ॥

যত এগোলাম, নীল গ্রহটির জন্যে টান তত বাড়ল। গ্রহটিকে জানবার আকাঙ্ক্ষা ততই দুর্নিবার হল। বুঝতে চেয়েছি, কেন এ হচ্ছে? এত সূর্য দেখলাম, এত রকম গ্রহে পাড়ি দিলাম, কিন্তু ঠিক এমনটি তো কখনও হয়নি!

এদিকে যত দেখছি গ্রহটিকে, ততই যেন চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। কী অপরূপ নীল-সাগর ওখানে, সুন্দর সবুজ বন-পাহাড়। মনে হল, না ; তবু পাহাড় বা ডাঙায় নামা ঠিক হবে না। অনেক জীবনহানি

হবে ওতে। কারণ, তখনও আমি বিরাট; আকারে পাঁচশো ফুট প্রায়। ধীরে ধীরে সাগরের দিকেই এগোই; কী একটা মহাদেশের গা-ঘেঁষে, ছোট্ট একটা দ্বীপ-মতো জায়গার কাছাকাছি। দ্বীপটা মহাদেশ থেকে মাইল দুয়েক দূরে। যেন অতি কষ্টে শুধুমাত্র মাথাটি তুলে সাগর-বুকে দাঁড়িয়ে।

আর একটু এগোতেই দেখলাম, মেঘ জমেছে; ঘন কালো মেঘ। যেন দেখতে দেখতে চোখের আড়াল হচ্ছে দ্বীপটি। নামলাম তবু; দ্বীপের খুব কাছাকাছি। সাগরজলে।—

কুল-ভাসানো প্রচণ্ড ঢেউ উঠল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া আর এই ঢেউ মিলে মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রলয় সৃষ্টি করল। এতে আমি আতঙ্কিত। এই ভেবে যে, দ্বীপে জীবন থাকলে ক্ষতিটা অপূরণীয় হবে। অবশ্য হলও তাই। সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি। স্পষ্ট দেখলাম, একটি সেতু, যা নাকি দ্বীপটিকে মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত করছিল, তার বেশ খানিকটা অংশ উড়ে যেতে। সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল। ঢেউয়ের দাপটে সে-ও কোথায় তলিয়ে গেল। দ্বীপটির খানিকটা অংশ ছিল ধনুকের কোটির মতো। দেখতে দেখতে সে-অংশটাও ডুবে গেল। প্রলয়, মহাপ্রলয় শুরু হল এবার। চারিদিকে শুধু ধ্বংস আর মৃত্যু, আর্তনাদ আর হাহাকার। বেলাভূমি ডুবল, ঘরবাড়ি ভাসল, গাছপালাকে দেখতে দেখতে গ্রাস করল সমুদ্র

একবার দেখলাম, আমার ধারেকাছেই কয়েকটা মৃতদেহ। ভাসছে। দেখেই অবাক আমি, আশ্চর্য তো! এরা দেখতে অনেকটা আমারই মতো। সন্দেহ হল, তবে কি আকারের এ-সাদৃশ্যই আমাকে এখানে টেনে এনেছে? এরই জন্যে গ্রহটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছি এতক্ষণ?

কিছুই ঠিক বোঝা গেল না। তবে কয়েক ঘণ্টা বাদে; ঝড়-বাদল কমে এল যখন, এবং যখন আমি আরও অনেকটা সংকুচিত হলাম, তখন হঠাৎ দেখি, অদূরেই সাগরপারে কে একজন কী সব খুঁজছে। কী খুঁজছে ও?—ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম; খুব

সাবধানে, জল ঠেলে। যাতে না ঢেউ ওঠে আবার। জীবটা না ভেসে যায়। এদিকে মুখোমুখি হতেই ও স্তম্ভিত। না, ঠিক আমার মতো প্রাণী ও আর কখনও দেখেনি বলেই মনে হল।

'থট্ ট্রান্স্ফারেন্স্' করে অভয় দিলাম ওকে। শুধালাম, কী খুঁজছো? ও জানাল,—আমার আত্মীয়-পরিজনকে। সব জলে ভেসে গেছে

কী? বুঝলেন কিছু? সাগর-পারে দাঁড়িয়ে-থাকা ওই সর্বস্বান্ত মানুষটিকে চিনলেন?—এ-অবধি বলে গল্প শেষ করেন মিঃ আয়েঙ্গার। একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। আমি তখন শীতে কাঁপছি, সমুদ্র থেকে প্রায় সাড়ে ছ'হাজার ফুট উঁচুতে। কোদাইক্যানেল শহরে সন্ধ্যে নামছে তখন। শহরটির ঠিক মাঝ... ...লে আমরা। পাহাড়-ঘেরা অপরূপ এক হ্রদের তীরে। ...লাম,—কী করে চিনবো? এ-গল্পের সবই যে অচেনা।

মিঃ আয়েঙ্গার বললেন,—এখন আ... তো কোথায়। কিছু নিশ্চয়ই চেনা এখন। অন্ততঃ সেই সর্বস্বান্ত মানুষটি, মিঃ আয়েঙ্গার নামে যার পরিচয়। এছাড়া, আরও কিছু জিনিস নিশ্চয় মনে পড়ছে আপনার। নিশ্চয় ভুলে যান নি, ক... বছর আগেকার সেই কুল-ভাসানো সমুদ্র-তরঙ্গের কথা—যার দাপটে ভারতের ধনুষ্কোটি দ্বীপটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মূল ভারত-ভূখণ্ড ও রা...শ্বরম দ্বীপের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী পামবান রেলসেতু ধ্বংস হল। কী? ...ন পড়ছে?

লোকটিকে উন্মাদ বলে সন্দেহ হল। কিন্তু তবু ... ভদ্রতার খাতিরে বললাম, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। আর আপনিই বুঝি সেই হতভাগ্য, ভেসে-যাওয়া আত্মীয়-পরিজনদের যিনি খুঁজছিলেন?

—হ্যাঁ, আমিই সেই;—মিঃ আয়েঙ্গার বলতে লাগলেন,—আর ওই আগন্তুকটি, মহাকাশ থেকে যে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল, সে যে ঠিক কে, তা আজও জানি না।

শুধালাম,—তারপর? তারপর কী হল?

মিঃ আয়েঙ্গার বললেন,—যা হল, তাই তো বললাম এতক্ষণ।

ঠিক ওই আগন্তুকের জবানীতে। ও যা যা আমায় বলেছিল, হুবহু তাই বলে গেলাম। অবিকল ওরই ভাষায়।

—কিন্তু ও-ই বা ওর জীবনকথা আপনাকে বলতে গেল কেন?—আমি তখন নাছোড়বান্দা। রীতিমত জেরা শুরু করলাম আয়েঙ্গারকে। এদিকে আয়েঙ্গারও দমবার পাত্র নন। সঙ্গে সঙ্গেই যেন মুখস্থ-করা উত্তর শুনিয়ে দিলেন,—কেন বললো, তা আগন্তুকের জবানীতেই শুনুন। আগে যতটুকু শুনেছেন, ঠিক তার পর থেকে!

তোমার আত্মীয়-পরিজনরা সব জলে ভেসে গেছে, এ-কথা শুনে মন আমার ভীষণভাবে দমে গেল। এত জায়গায় ঘুরেছি এত গ্রহে-উপগ্রহে; কিন্তু জীবনের ক্ষতি ঠিক এমনভাবে কোথাও ক'রিনি। বলি, তোমার পরিজন যারা গেছে, তারা তো গেছে আমারই জন্যে। আমি পৃথিবীতে নেমে এসেছি বলে। তাই ঠিক করলাম, তোমাকে অন্ততঃ সব বলা উচিত। কৈফিয়ৎ হিসেবেই হয়তো। অবশ্য বলার পেছনে অন্য কারণও আছে। তোমার সঙ্গে আমার বাইরের মিলটাও বড় কম নয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি শান্ত হয়ে দাঁড়াও। অন্য কিছু না ভেবে। 'থট্ ট্রান্স্ফারেন্স্' করে তোমায় সব বলছি

মিঃ আয়েঙ্গার বললেন, 'থট ট্রান্স্ফারেন্স্' করে আগন্তুক আমাকে তারপর যে দীর্ঘ কাহিনী শোনাল সে তো তার জবানীতেই এতক্ষণ ধরে শুনলেন।

গল্প-শোনার অবসরে বারবার লক্ষ্য করেছি, আগন্তুক ক্রমেই ছোট হচ্ছে। সংকুচিত হচ্ছে। গল্প যখন শুরু হয় আকারে সে তখন আমার তিন গুণ; আর যখন শেষ হয়, তখন এক টুকরো নুড়ির চেয়ে বড় নয় সে।

—বিদায় বন্ধু বিদায়!—শেষ করার মুহূর্তে আগন্তুক বলে উঠেছিল—আমার জন্যে দুঃখ করো না। তবে নিজেরা সাবধান সৃষ্টির উপর অতি-খবরদারি ভালো নয়।

[ হেনরী হেজ্-এর 'হি হু স্র্যাঙ্ক' অবলম্বনে

॥ সমাপ্ত ॥